নকশালদের শেষ সূর্য

সম্পাদনা

এম আর আখতার মুকুল

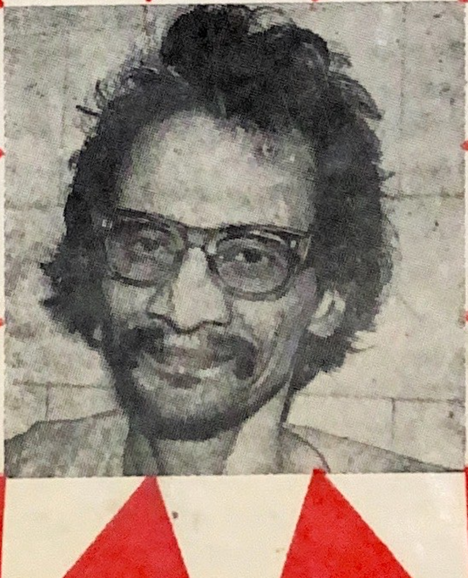

সম্পাদনায় ঃ এম আর আখতার মুকুল

নকশালদের শেষ সূর্য

সাগর পাবলিশার্স
নিউ বেইলী রোড ঢাকা-১০০০

ফেরদৌস ডিলন
১৮৪, ঢাকা নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫০ ৪০ ১৫

নকশালদের শেষ সূর্য

সম্পাদনায়ঃ এম আর আখতার মুকুল

প্রথম মুদ্রণ

১৫ই আশ্বিন ১৩৯৬

১লা অক্টোবর ১৯৮৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	ঃ	কালাম মাহমুদ
অলংকরণ	ঃ	মুনীর খান
কমপিউটার কম্পোজ	ঃ	শ্রেয়া কমপিউটার্স ঢাকা
মুদ্রাকর	ঃ	বিকাশ মুদ্রণ কাওরান বাজার ঢাকা

NAKSHALDER SHESH SURJYA Edited by M.R. Akhtar Mukul
Published by Mustafa Hasan Nasir (Kabi)

SAGAR PUBLISHERS New Baily Road Dhaka- 1000

Price: Bangladesh Tk. 50 / India Rs. 25/ Overseas $ 5 .00

মূল্য ঃ বাংলাদেশ ৫০ টাকা / ভারত ২৫ রূপী/ বিদেশ ৫ ডলার

উৎসর্গ

আমি স্বয়ং শ্রেণীস্বার্থে নকশালবাদী
মার্কসীয় মতাদর্শের সঙ্গে ভিন্নমত
পোষণ কোরলেও, একদা এই
রাজনৈতিক মতবাদে উদ্বুদ্ধ হোয়ে
শংকাহীন চিত্তে যাঁরা দলে দলে
আত্মদান কোরেছেন,
তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

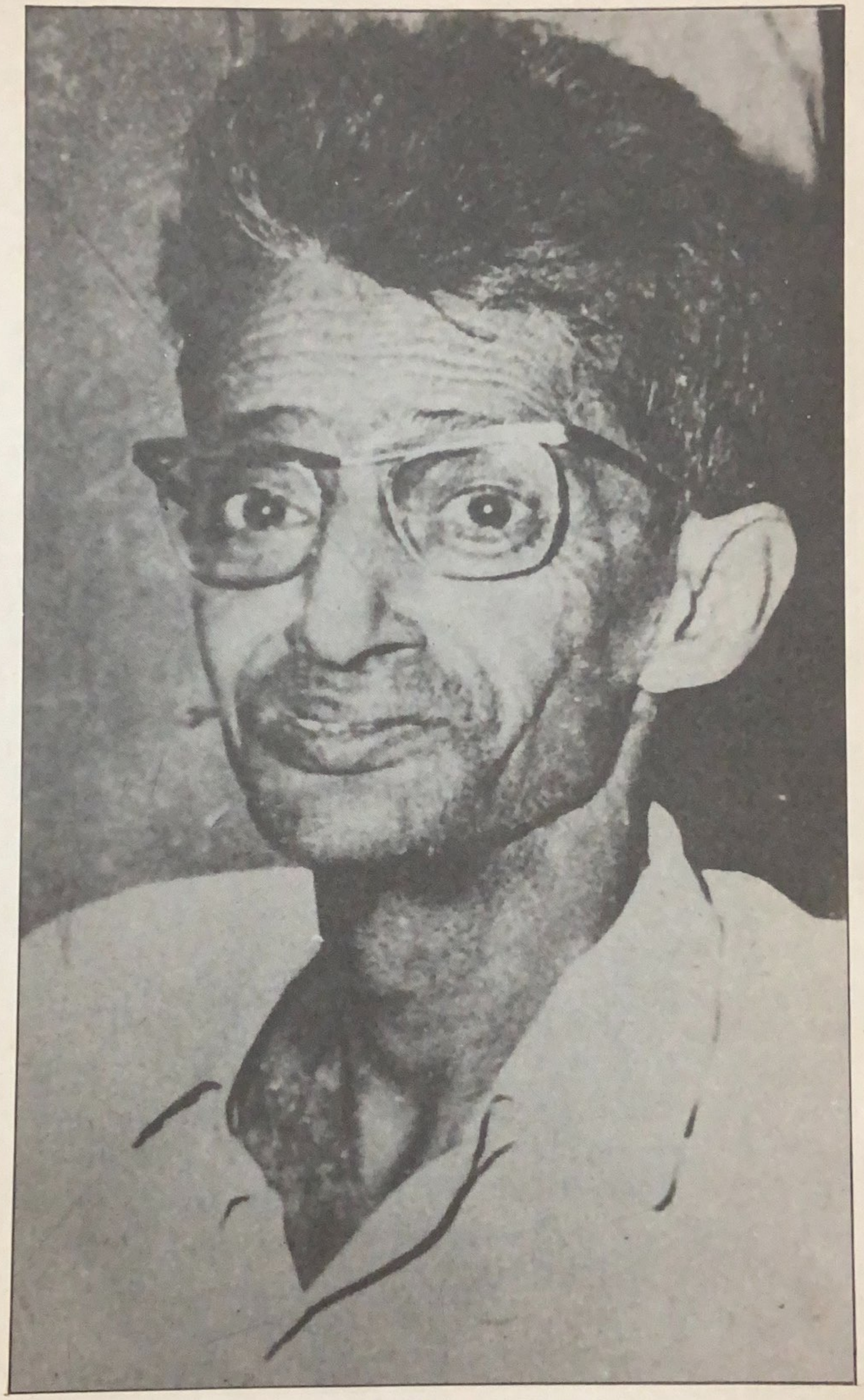

নকশাল আদর্শের স্রষ্টা কমরেড চারু মজুমদার

জন্মঃ ১৯১৭ বেনারস   মৃত্যুঃ ২৮.৭.১৯৭২ কোলকাতায় পুলিশ হেফাজতে

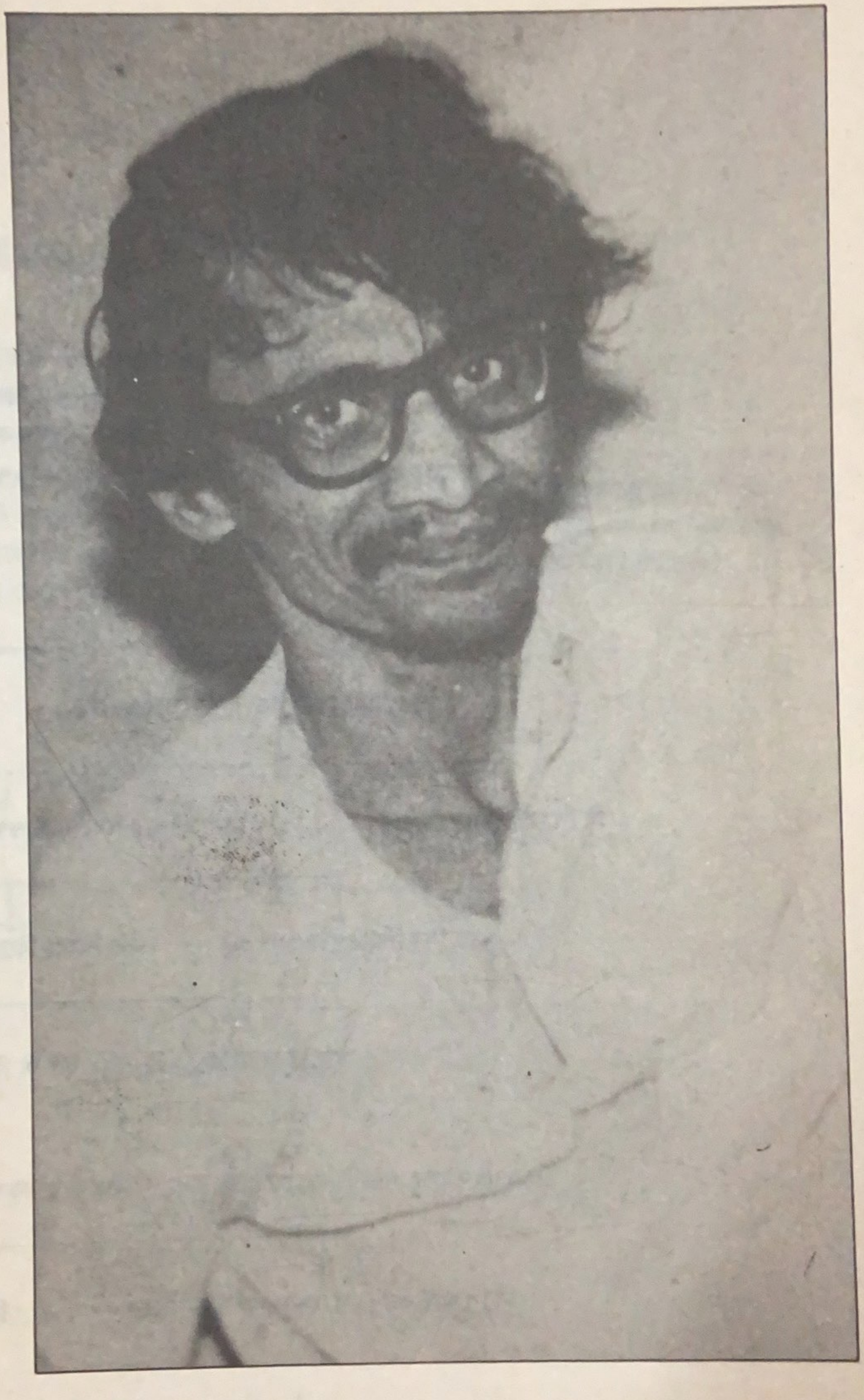

নকশালদের শেষ সূর্য কমরেড আজিজুল হক

৭০ বছরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বৃহৎ ভাঙ্গন

পার্টি গঠনের প্রথম উদ্যোগ	ঃ	কমরেড এম এন রায় (বহিস্কৃত ১৯২৯)
স্থান ও তারিখ	ঃ	তাসখন্দ (রাশিয়া) ১৭ অক্টোবর ১৯২০
৭ সদস্য-বিশিষ্ট প্রথম কমিটির সম্পাদ ক	ঃ	কমরেড মুহম্মদ শফিক
ভারতের মাটিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির অগ্রপথিক (১৯২১-২৭)	ঃ	মুজাফ্ফার আহমদ, আব্দুল হালিম, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং আব্দুর রাজ্জাক (বাংলা প্রেসিডেন্সী); শওকত উসমানী (আলিগড়-কানপুর); শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে,সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে এবং এস এস মিরাজকার (বোম্বে প্রেসিডেন্সী); গুলাম হুসায়ান (পাঞ্জাব); এম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী); এবং আমীর হয়দার খান (দঃভারত)

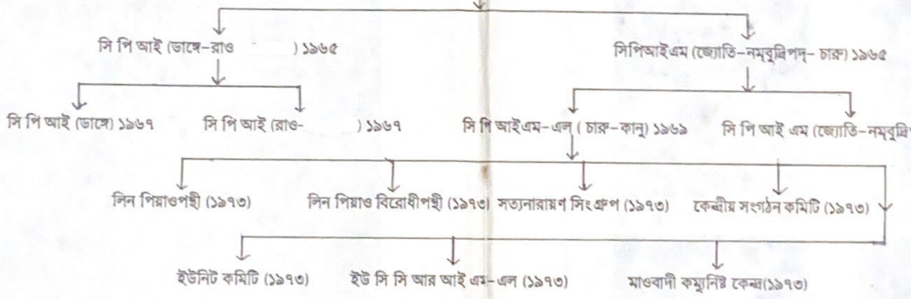

❑ ১৯৭৩ সালের পরবর্তী বছরগুলোতে নানা ঘটনাপ্রবাহে নকশালপন্থী এই ৭টি উপদলের বিলুপ্তি ঘটে এবং আশি দশকের শেষার্ধে ৩টি উপদলে পুনর্গঠিত হয়

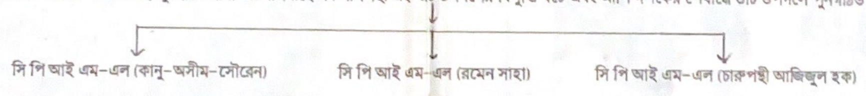

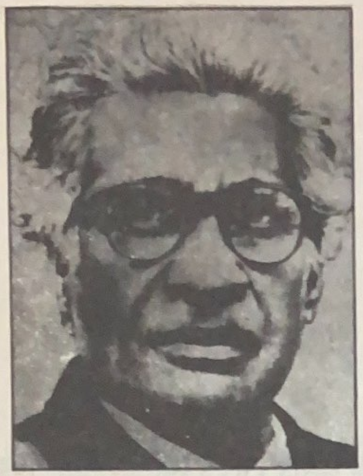

কমরেড এম এন রায়

কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ

কমরেড আব্দুল হালিম

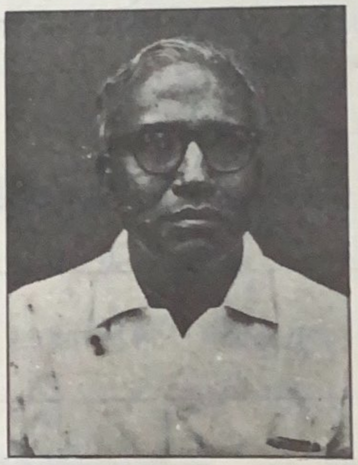

কমরেড ই এম এস নম্বুদ্রিপদ্‌

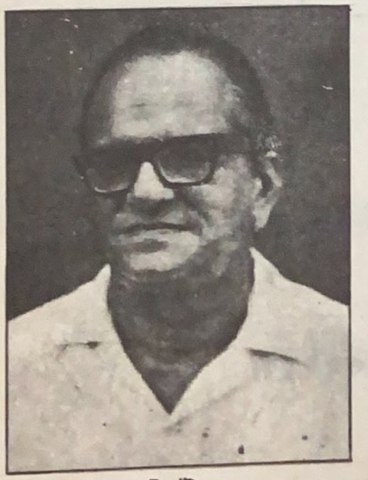

কমরেড বি টি রনদেভে

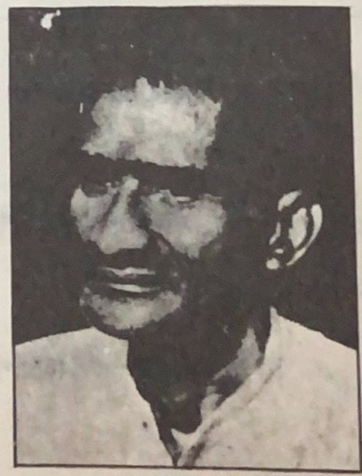

কমরেড আমীর হায়দার খান

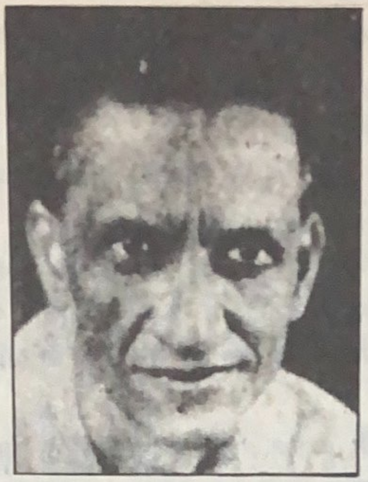

কমরেড এস এ ডাঙ্গে

কমরেড জ্যোতি বসু

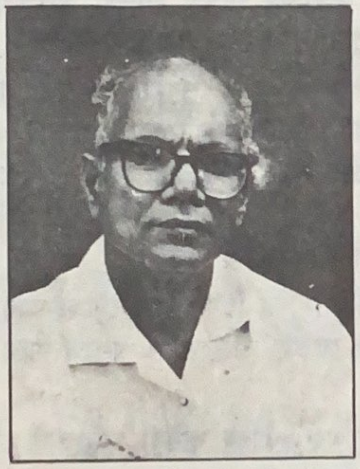

কমরেড পি সুন্দরাইয়া

কমরেড কৃষ্ণ পিল্লাই

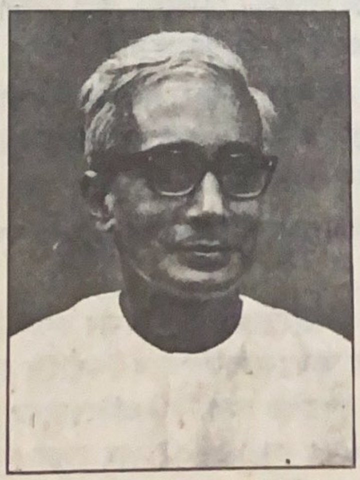

কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত

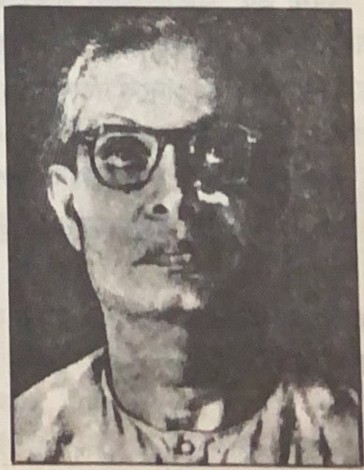

কমরেড বংকিম মুখার্জি

মুখবন্ধ

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের কথা। ঢাকা থেকে সপরিবারে হেঁটে প্রায় পৌনে দু'শ মাইল দূরত্বের হিলি সীমান্ত অতিক্রমের পর কোলকাতায় হাজির হোয়ে সর্বপ্রথম নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তাপ উপলব্দি কোরতে সক্ষম হই।

হতবাক হোয়ে দেখলাম কোলকাতার প্রতিটি রাস্তার মোড়ে ডিউটির ট্রাফিক পুলিশকে পাহারা দিচ্ছে দু'জন কোরে সশস্ত্র হোম গার্ড। এদের রাইফেলগুলো 'জবর দখলের' ভয়ে লোহার শিকল দিয়ে জোয়ানদের কোমরে বাঁধা। আর্মড পুলিশের দল এ সময় প্রাকাশ্যে যাতায়াতে পর্যন্ত সাহসী নয়; এদের জন্য প্রিজনভ্যানের বিশেষ ব্যবস্থা। প্রতিটি থানার নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পিত হোয়েছে দিল্লী থেকে আগত 'সি আর পি' নামক সশস্ত্র বাহিনীর হাতে।

এটা এমন এক সময় যখন সন্ধ্যার পর চৌরঙ্গী এলাকা প্রায় জনশূন্য। মেট্রো সিনেমা হলে দু'টো 'নাইট শো' বন্ধ। বড় বড় দোকানগুলোতে বিরাট সব লোহার 'কোলাপ সেবল গেট' লাগানো এবং এক সঙ্গে একাধিক পুরুষ গ্রাহকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিত্তশালীদের এলাকাগুলোর অনেক বাড়ির নীচের তলা ভাড়াটে শূন্য। সর্বত্রই এই নকশাল আতংক'।

এধরনের এক নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলায় এ সময় শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলায় অবস্থানরত সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের সংখ্যা প্রায় এক লাখের মতো। প্রায়শই এদের দমননীতি মাত্রাতিরিক্ত হোয়ে দাঁড়াতো। গ্রেফতারের সময় প্রতিরোধ করায় গুলি কোরে নকশাল হত্যা এবং 'প্রিজন ভ্যান' ভেঙ্গে পালাবার চেষ্টা করায় নির্বিচারে নকশাল বন্দীদের হত্যার বিষয়গুলোর খুব একটা বিশ্বাসযোগ্যতা ছিলোনা বোললেই চলে।

এসব বেপরোয়া হত্যাকান্ডের ফলে কত নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে; আর কত মাতার ক্রোড় যে শূন্য হোয়ে গেছে, তা' আজ পর্যন্ত কেউই সঠিকভাবে বলতে পারে না। অনেক তথ্যই গোপন রোয়ে গেলো।

পশ্চিম বাংলায় ক্ষয়িষ্ণু সমাজ জীবনে এসময় এক ভয়াবহ দুর্দিন। পাকিস্তানী ফৌজি হামলায় পূর্ব বাংলার শরণার্থি হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনে হতো নকশাল আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোয়ে কেনো এই তরুণ-তাজা প্রাণগুলো এভাবে আত্মদান কোরছে? আর কেনোই বা সিপিআইএম-নকশালদের আদর্শের সংঘাতের এধরনের ভয়াবহ রক্তাক্ত বহিঃপ্রকাশ?

এমনি এক সময়ে একদিকে নকশাল আন্দোলন থেকে চীনা নেতৃবৃন্দের সমর্থন প্রত্যাহার ও নকশাল নেতৃত্বে চরম মতবিরোধ সৃষ্টি এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হোয়ে দাঁড়ালে পশ্চিম বাংলায় নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হোয়ে যায়।

কোন কোন মহলের মতে নকশালবাড়ি আন্দোলন হোচ্ছে ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়। আসলে কি তাই?

সম্প্রতি বাংলাদেশের বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীতজ্ঞ ও স্নেহভাজন বাবু রহমান কথা প্রসঙ্গে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে একটা বই লেখার জন্য আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেন এবং পশ্চিম বাংলার পত্র পত্রিকায় এতদ্‌বিষয়ে প্রকাশিত বেশ কিছু প্রতিবেদনের কপি সরবরাহ করেন। উপরন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক কমরেড-এর কাছ থেকে আমি নকশাল আদর্শ সম্পর্কিত বহু সংখ্যক পুস্তিকা এবং দলিল মূল্যায়ন করার সুযোগ লাভ

করি। ফলে নকশাল আদর্শ, নকশাল আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাত–সংঘর্ষ ইত্যকার বিষয়াদি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভে সক্ষম হই।

এসব দলিলপত্র এবং সম্প্রতি রচিত প্রতিবেদনগুলোর মধ্যে কোলকাতার 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজবন্দী কমরেড আজিজুল হকের ডাইরী আমাকে বিমুগ্ধ করে। জ্যোতি বসুর কমিউনিষ্ট সরকারের কারাগারে আটক এই রাজবন্দীর ৫৩ দিনের রোজ নামচা পড়ে আমি তন্ময় হোয়ে রইলাম। এতো শুধু একজন রাজবন্দীর ডাইরী নয়– এটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ পরিচ্ছদ বলা যায়।

বোলতে দ্বিধা নেই যে, কমরেড আজিজুল হকের ডাইরী পড়তে যেয়ে গত ৪০ বছর ধোরে আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় অত্যন্ত সন্তর্পণে লুক্কায়িত এক ভয়ংকর স্মৃতি জাগরুক হোয়েছে। প্রায় ৪০ বছর আগেকার কথা। আমি তখন 'রণদেভ–এ থিসিসে'র কট্টর সমর্থক। এ সময় অর্থাৎ ১৯৪৮–৫০ সালে দিনাজপুর জেলে প্রথমে তৃতীয় শ্রেণীর রাজবন্দী এবং পরবর্তীতে তৃতীয় শ্রেণীর সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী হিসেবে যে দুর্বিসহ অভিজ্ঞতা লাভ কোরেছি, তাকে শতগুণ বাড়ালেও কমরেড আজিজুল হকের মর্মান্তিক আর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সমকক্ষ হোতে পারে না।

সত্যি কথা বোলতে কি, সংসার জীবনে প্রবেশ করার পর বহু প্রচেষ্টা কোরেও আমি আর 'ডি–ক্লাসড' হোতে পারিনি। তাই শ্রেণীস্বার্থে স্বাভাবিকভাবেই নকশালবাড়ির মার্কসীয় মতাদর্শের সঙ্গে আমার ভিন্ন মত রোয়েছে।

তবুও এক সময় এই রাজনৈতিক মতবাদে উদ্বুদ্ধ হোয়ে যাঁরা নির্ভীকভাবে আত্মদান কোরেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং সুদীর্ঘ ১৮ বছর ধোরে দুঃসহ কারাজীবন ভোগ করার পরও নকশালবাড়ির মার্কসীয় আদর্শের প্রতি কমরেড আজিজুল হকের মতো যে মহান ব্যক্তিত্ব আজও পর্যন্ত অবিচল ও অটল রোয়েছেন তাঁদের কাহিনী সম্বলিত আমার সম্পাদিত এই গ্রন্থ 'নকশালদের শেষ সূর্য'।

সবশেষে একটি কথার উল্লেখ কোরতে হয় যে, এই বইটিতে সংকলিত নিবন্ধগুলোর শিরোনাম সংশ্লিষ্ট লেখকের নয়–এসবই আমার দেয়া নতুন শিরোনাম

১ নওরতন কলোনী
নিউ বেইলী রোড,
রমনা, ঢাকা– ১০০০

এম আর আখতার মুকুল
১৫ই আশ্বিন ১৩৯৬ ঢাকা

লেখকের অন্যান্য বই

পনী এক্সপ্রেস [অনুবাদ]
রূপালী বাতাস [৩য় সং]
মুজিবের রক্তলাল [২য় সং]
রূপালী বাতাস সোনালী আকাশ
লন্ডনে ছক্কু মিয়া
আমি বিজয় দেখেছি [১৪ তম সং]
বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন
ওরা চারজন
বয়ান্নোর জবানবন্দী
চল্লিশ থেকে একাত্তর [২য় সং]
গয়রহ
কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী
লেছড়াগঞ্জের লড়াই
আব্বা হুজুরের দেশে [১ম খন্ড]
আব্বা হুজুরের দেশে [২য় খন্ড]
একাত্তরের বর্ণমালা
বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধঃ
দলিলপত্র [১৫তম খন্ড]
বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধঃ
দলিলপত্র [এক খন্ডে সংক্ষিপ্তকরণ]
মুক্তিযুদ্ধেরআলোকচিত্র

সূচি

এম আর আখতার মুকুল ঃ নকশালদের শেষ সূর্য
শুভাশিসমৈত্র ঃ জেলে বীভৎস পুলিশী অত্যাচারের শিকার কমঃ আজিজুল হক
কমরেড আজিজুল হক ঃ 'যাঁদের সঙ্গে জেল খেটেছি এখন তাদের জেলেই আমি'
রমা প্রসাদ ঘোষাল ঃ নির্বাচনে সি পি আই এম-কে ঘায়েলে দিল্লীর নয়া কৌশল
কমরেড কানু সান্যাল ঃ 'ভারতবর্ষে কোন সাচ্চা কমিউনিষ্ট পার্টি নেই'
বিকাশ কুমার ঃ জ্যোতি বসুর অমোঘ অস্ত্র কমঃ আজিজুল হকের মুক্তি

পরিশিষ্ট

নির্মল ঘোষ ঃ নকশালদের রক্তাক্ত ইতিহাসে এখন বিস্মৃতির অন্তরালে
কমরেড তপন গাইন ঃ 'চারু মজুমদারকে ধরিয়ে দিয়েছিল নকশালরাই'
কমরেড সৌরেন বসু ঃ কমরেড চারু মজুমদারের জীবনের শেষ অধ্যায়

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী এবং পত্র পত্রিকা

১. The Naxlite Movement : Biplab Dasgupta
২. The Naxlite Movement : Sanka Gosh
৩. 'Spring Thunder over India' : Editorial People's Daily 5 june 1967
৪. "The Betrayal" : Liberation, May 1968
৫. 'To be or not to be with them' : Liberation, May 1968
৬. 'Why must we form the Party now' : Liberation, March 1969
৭. 'Party's Tasks Among the Workers' : Liberation, March 1970
৮. Editorial : Frontier, 18.9. 1971
৯. Naxalbari & After Vol I & II
১০. 'নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য': নির্মল ঘোষ
১১. চারু মজুমদারের কথা : সৌরেন বসু
১২. 'নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের পর তার মূল্যায়ন' সম্পাদকীয় পিপলস ডেইলী , ৫ জুলাই ১৯৬৭
১৩. 'নির্বাচন বয়কট করো' – চারু মজুমদার : দেশব্রতী, ২১ নভেম্বর ১৯৬৮
১৪। 'ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন করে এগিয়ে চলুন' – চারু মজুমদার : দেশব্রতী, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯
১৫. '৭০–এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন' : দেশব্রতী, ২২ জানুয়ারী ১৯৭০
১৬. 'বাংলা–বিহার–উড়িষ্যার সীমান্ত কৃষক সংগ্রামের বিকাশ, অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা' : দেশব্রতী, ২৩ এপ্রিল ১৯৭০
১৭. সম্পাদকীয়, যুগান্তর ১৫ আগষ্ট ১৯৭১
১৮. 'ছাত্র–যুবকদের কাছে আহবান' : চারু মজুমদার, ২১ আগষ্ট ১৯৭১
১৯. সম্পাদকীয়, যুগান্তর ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
২০. 'জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ' : চারু মজুমদার, ৯ জুন ১৯৭২
২১. 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' (৪ নভেম্বর ১৯৭২) : ৬ জন নকশাল নেতার বিবৃতি
২২. ' মোর এবাউট নকশালবাড়ি' : কমরেড কানু সান্যাল, এপ্রিল ১৯৭৩
২৩. পশ্চিমবঙ্গ বন্দীমুক্তি ও গণবাদী কমিটি কর্তৃক পুলিশী নির্যাতনের প্রাথমিক রিপোর্ট (১৯৬৯–১৯৭৬ সময়কাল)
২৪. 'মার্কসবাদ ও মূর্তি ভাঙ্গা' : 'অনীক' বিশেষ সংখ্যা ১৯৭৮
২৫. 'প্রতিক্ষণ' কলিকাতা–১৩ : ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ সংখ্যা
২৬. 'প্রতিক্ষণ' কলিকাতা–১৩ : ২ জানুয়ারী ১৯৮৮ সংখ্যা
২৭. 'আলোকপাত,' এলাহাবাদ : এপ্রিল ১৯৮৯ সংখ্যা
২৮. বাস্তব দৃষ্টিপাত, কলিকাতা : পূজাসংখ্যা ১৯৮৭

নকশালদের শেষ সূর্য

এম আর আখতার মুকুল

নকশালদের শেষ সূর্য
এম আর আখতার মুকুল

বাংলাদেশে সর্বহারা পার্টি আর পশ্চিম বাংলার নকশালপন্থী। শাসকগোষ্ঠী এবং জোতদার ও বিত্তশালীদের দৃষ্টিতে 'ভয়াল' ও 'ভয়ংকর'। এবারের প্রতিবেদন হোচ্ছে ১৯৮৯ সালে পশ্চিম বাংলার নকশালপন্থীদের হাল-হকিকত সম্পর্কিত। অনেকের মতে, ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মোট তেরো বছরের নকশাল আন্দোলন এখন বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের অধ্যায় মাত্র। কিন্তু বাস্তবে কি তাই?

তা'হলে তো গোড়া থেকেই সংক্ষিপ্ত আকারে কথাগুলো বোলতে হোচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের ওধারে শিলিগুড়ি। আর এই শিলিগুড়ির অদূরে ৩টি থানা যথাক্রমে 'ফাঁসি দেওয়া' 'খড়িবাড়ি' এবং 'নকশালবাড়ি'। আজ থেকে ২২ বছর আগে এই এলাকার শোষিত ক্ষেতমজুর এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের নেতৃত্বে ঘোষিত হোয়েছিলো এক 'রক্তাক্ত সশস্ত্র বিপ্লব'। নেতার নাম কমরেড চারু মজুমদার। জন্ম বেনারসে (১৯১৭) এবং কলেজ জীবন পাবনার এডোয়ার্ড কলেজে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের এহেন সন্তান চারু মজুমদার কলেজ জীবনের পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখেই যোগ দিলেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে। তখন দেশ বিভাগ হোয়ে গেছে। এসবের আরও দুই দশক সময় অতিক্রম করার পর কমরেড চারু মজুমদারের কর্মক্ষেত্র হোচ্ছে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এর চা-বাগান ছাড়াও শিলিগুড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। অভূতপূর্ব কর্মদক্ষতার মাঝ দিয়ে কমরেড মজুমদার সংগঠিত কোরলেন জলপাইগুড়ির চা-বাগান শ্রমিক এবং নকশাল বাড়ি এলাকার ভূমিহীন কৃষকদের।

এটা হোচ্ছে ১৯৬৭ সালের কথা। পশ্চিম বাংলার ক্ষমতায় তখন শহুরে বামপন্থী নেতৃত্বের যুক্তফ্রন্ট সরকার। অথচ সংসদীয় রাজনীতির তীব্র বিরোধিতা কোরে কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে তখন দ্রুত নকশাল আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটছে। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী শহুরে ছাত্র-যুবকেরা ''বিপ্লব রোমাঞ্চে'' অনুপ্রাণিত হোয়ে দলে দলে নকশাল আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু কোরছে।

বামপন্থী নেতৃত্বের যুক্তফ্রন্ট সরকারের কথা হোচ্ছে, অবিলম্বে রাজ্য সরকার নকশাল আন্দোলন দমনে সক্ষম না হোলে, কেন্দ্রীয় ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার ''আইন-শৃংখলা'' রক্ষার অছিলায় পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি কোরতে পারে।

বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্বমন্ত্রী কমরেড হরেকৃষ্ণ কোনার স্বয়ং নকশালবাড়ি যেয়ে কয়েক দফা বৈঠক কোরলেন চারু মজুমদার আর কানু সান্যালের সংগে। বহু অনুরোধ-উপরোধ কোরলেন ''হটকারী নকশাল'' পথ পরিত্যাগের জন্য। শেষ অবধি আলোচনা ব্যর্থ হলো।

পক্ষান্তরে কমরেড মজুমদার সিপিএম-এর সংশোধনবাদী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই-এর আহবান জানালেন। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য হোচ্ছেঃ

'' ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটি একটি রাজনীতিক পন্হা গ্রহণ করেছেন – যা মূলতঃ বিপ্লববিরোধী; চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙের চিন্তা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী; শ্রেণী সমঝোতা ও সংশোধনবাদী আদর্শবাদের ভিত্তিতে গঠিত।.........

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় কমিটি কোন বিপ্লবী কমিটি নয়। অতএব, প্রত্যেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর বিপ্লবীর কর্তব্য হল এই কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।''

১৯৬৭ সালের শেষ প্রান্তে এসে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন। সিপিএম-এর নিজস্ব হিসাব মতো, মাত্র ৪৮ মাস সময়ের ব্যবধানে পার্টির সদস্য সংখ্যা হ্রাস প্রায় ৪১ হাজারের মতো। ১৯৬৪ সালে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে 'রেড কার্ড' মেম্বারের সংখ্যা ছিলো ১,০৬,৩১৩ জন; ১৯৬৮ সালে তা' ৬৫,৪০২ জনে নেমে আসে।

এখানেই শেষ নয়। সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবিত বর্ধমান সম্মেলনের আগেই ''হটকারী দর্শনের'' কট্টর সমর্থক ৪০০ জন নেতা-উপনেতাকে বহিষ্কার করা হলো। এঁদের উলেখযোগ্য হোচ্ছেন সর্বকমরেড চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, সুশীতল রায় চৌধুরী প্রমুখ।

পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত হলো ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি''। ইংরেজী মাসিক 'লিবারেশন' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'দেশব্রতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো এঁদের চাঞ্চল্যকর কথাবার্তাঃ

''...... এ আর গোপন নেই যে, এই সব লোক (জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে সিপিএম), কৃষকদের সংগ্রামকে রক্তে নিমজ্জিত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির হাতিয়ার হিসাবে, তাঁদের রাষ্ট্র প্রশাসন যন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করছেন। প্রতিক্রিয়ার এই সব দালাল, যাঁরা মার্কসবাদী বলে মুখোশ পরে বেড়ান, বর্ধমান (প্লেনাম) তাঁদের মুখোশ খুলে ফেলার কাজ সম্পন্ন করেছে।...... যে পন্থা ধরে এই সুবিধাবাদীরা চলেছেন তা আসলে শ্রেণী সমঝোতার- শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজনীয় স্বার্থগুলির প্রতি বেইমানির পথ।....''

এ ধরনের এক চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মহাচীনের ক্ষমতাশীন কম্যুনিস্ট সরকার প্রকাশ্যেই নকশালপন্থীদের মদদ জোগালো। ১৯৬৭ সালের ৫ই জুলাই 'পিপলস ডেইলী' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ''ভারতের আকাশ থেকে বসন্তকালীন বৃষ্টি''। এই ঐতিহাসিক সম্পাদকীয়তে ভারতের নকশালপন্থীদের পথ এবং কর্মপন্হাকেই সঠিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। উপরন্তু সিপিএমকে আখ্যায়িত করা হয় ''আধুনিক সংশোধনবাদী''।

১৯৬৭ সালের নভেম্বর নাগাদ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত নকশালপন্হীদের এক সম্মেলনে নতুন দল গঠিত হলো। নাম '' সারা ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি''। ঘোষণাপত্রে বলা হলোঃ

''...... কমরেড লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভারতে এখন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তত। কিন্তু সিপিআই (এম)-এর নয়া সংশোধনবাদী নেতৃত্ব জনগণ ও পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন; এঁরা শ্রেণী-সমঝোতা ও পার্লামেন্টারী পথের মোহে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করেছেন।......''

অবশ্য এই সমন্বয় কমিটি গঠিত হবার আগেই ১৯৬৭ সালের ২৩শে মে নকশালবাড়ি এলাকায় সোনম ওয়াংদি নামক জনৈক পুলিশ কনস্টবল হত্যার মাধ্যমে কমরেড চারু মজুমদার ''রক্তাক্ত বিপ্লব'' শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

১৯৬৮ সালের ১৪ই মে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের ১ম বার্ষিকীতে বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা আবার মিলিত হোলেন কোলকাতায়। বিরাজমান পরিস্থিতিতে দলের নতুন

নামকরণ কোরলেন, ''সারা ভারত কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি''। ৯ দফা নতুন ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হলো। ৫ম দফায় বলা হলো ঃ

''ডাঙ্গে বিশ্বাসঘাতককেরা (সিপিআই) আর নয়া সংশোধনবাদী (সিপিএম) সহ সব ঢং-এর সব ধাঁচের' সংশোধনবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট নয়া সংশোধনবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের 'চাকর' এবং নিঃসন্দেহে ভারতীয় জনগণের শত্রু।''

বহু আলাপ-আলোচনা এবং তর্কবিতর্কের পর ১৯৬৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে চারু মজুমদারের প্রস্তাব মতো একটি সাচ্চা মার্কসিস্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরই জের হিসেবে মাত্র ১০ সপ্তাহের মধ্যে ১৯৬৯ সালে ২২শে এপ্রিল গঠিত হলো ''ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী)''। ইতিহাসের পাতায় এঁরাই চিহ্নিত হোয়েছেন নকশালবাদী হিসাবে।

১৯৬৯ সালের ১লা যে কোলকাতার ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় কমরেড কানু সান্যাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিলেন, ''ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (এম-এল)'' গঠনের। এরপর পশ্চিমবঙ্গে শুরু হলো রক্তাক্ত ইতিহাস।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসই বোলতে হয়। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট (কিছুদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের হাতে) এবং পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন সিপিএম সরকারের মোকাবেলায় এসব নকশালপন্থীরা এখন প্রায় নিশ্চিহ্নের পথে। এই বছরগুলোতে পশ্চিম বাংলায় একদিকে ''জোতদারদের গলা কাটা চোলছে চোলবে'' এবং অন্যদিকে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সিআরপি দিয়ে কিভাবে নকশাল কর্মীদের হত্যা করা হোয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

সত্যি কথা বোলতে কি, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরাট হৈ চৈ আর ডামাডোলের মধ্যে প্রচন্ড দমন নীতির ফলে নকশাবাদী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হোয়ে পড়ে। তবুও এ সময় পশ্চিম বাংলার অনেকগুলো জায়গায় নব কংগ্রেস বনাম নকশালবাদী এবং সিপিএম আর নকশালবাদীদের মধ্যে খন্ড যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ সম্পর্কে গবেষক নির্মল ঘোষের বক্তব্য রীতিমত রোমহর্ষক। তিনি লিখেছেন ঃ

'' .... পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান ঘাঁটিগুলো হোল কোলকাতা এবং হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগনা ও বর্ধমান জেলা। পার্টির দুই তৃতীয়াংশ সদস্য এসেছেন এই অঞ্চলগুলো থেকে। লক্ষ্যণীয়, কোলকাতায় এবং এই জেলাগুলোতে নকশালবাদীদের ক্রিয়াকলাপ ছিল অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান। ফলে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান বেসগুলোতে ভাঙন দেখা দেওয়া সম্ভব ছিল। সুতরাং সচেতনভাবে নকশালবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না। আর একবার সংঘর্ষ শুরু হওয়া মানেই হোল বেড়ে চলা। এমনকি কামাখ্যা ব্যানার্জী, যিনি কানু সান্যাল, খোকন মজুমদার, কদম মল্লিক প্রমুখের সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা ঘটান, যখন পুনর্বার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন, তিনিও নকশালবাদীদের হাতে খতম হন। এভাবেই প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে পারস্পরিক সংঘর্ষ চলতে থাকে।

''একটি পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৭১-এর মার্চ থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে নকশালবাদীরা ২১ জন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট ক্যাডারকে হত্যা করে এবং মার্কসবাদী পার্টিও সমসংখ্যক নকশাল ক্যাডারকে হত্যা করে। উভয় পার্টির মধ্যে উক্ত সময়কালে মোট ১২৩টি সংঘর্ষ

মোট ১২৩টি সংঘর্ষ হয়, যার মধ্যে ৬৮টি বাঁধান মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট কর্মীরা এবং বাকী ৫৫টি শুরু করে নকশালবাদীরা। এবং এরপর থেকে সিপি (এম) ও পুলিশের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে অনেক বেশী সংখ্যায় নকশালবাদীরা নিহত হতে থাকে।

''১৯৭০-এর মার্চ থেকে ১৯৭১-এর আগষ্ট পর্যন্ত ১৮ মাসে শহরে আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গে ১,৩৪৫ জন নকশালবাদী নিহত হন;সিপি এম-এর কর্মী নিহত হন ৩৬৮ জন। ঐ সময়কালের মধ্যে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পরপর পাঁচটি বীভৎস রাজনৈতিক গণহত্যাকান্ড সংগঠিত হয়।

বারাসত ঃ ১৯ নভেম্বর ১৯৭০

ডায়মন্ডহারবার ঃ ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭১

কোন্নগর ঃ ১ জুন ১৯৭১

বরানগর—কাশীপুর ঃ ১২—১৩ আগষ্ট ১৯৭১

হাওড়া ঃ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

সংবাদপত্র এবং পুলিশী ভাষ্যানুযায়ী এই গণহত্যাগুলোর যাঁরা শিকার হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই নকশালপন্থী অভিহিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সভ্য বা সমর্থক।''

কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোলকাতার রাজপথের দেয়াল থেকে নকশালবাদীর চিকাগুলো মুছে যায়নি। এগুলো হোচ্ছে ঃ

ক) ''তাই তাই তাই,বর্ধমানে যাই,

বর্ধমানে গিয়ে দেখি,সি পি এম নাই।''

খ) ''দিল্লী থেকে এলো গাই।

সঙ্গে বাছুর সিপি আই।''

গ) ''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অছিলা করে চেয়ারম্যান মাও-এর

বিরুদ্ধে কথা বললে জিভ উপড়ে ফেলব।''

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বোলতে গেলে বোলতে হয় যে, ১৯৭২ সাল নাগাদ নকশালবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের প্রায় পরিসমাপ্তি। জুন মাসে কমরেড চারু মজুমদারের প্রকাশিত বিবৃতির মোদ্দা কথাটা হোচ্ছেঃ

''আমাদের দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম একটা পর্যায়ে ওঠার পর আমরা ধাক্কা খেয়েছি। এই সময় আমাদের কাজ হোল পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখা। পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শ্রমিক কৃষক জনগণের মধ্যে পার্টি গঠন করতে হবে। রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ পার্টি যদি আমরা গঠন করতে পারি, তবেই আমরা পারব ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে, তবেই আমরা পারব সংগ্রামকে পূর্বের তুলনায় আরও উন্নত পর্যায়ে তুলতে।''

এধরনের এক চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৭৩ সালের মধ্যে জেলের ভিতরে ও বাইরে বেশ কয়েকজন নকশাল নেতা চারু মজুমদারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোলেন। তাঁদের মধ্যে কমরেড অসীম চ্যাটার্জী, কমরেড সুনীতি ঘোষ, কমরেড খোকন মজুমদার এবং কমরেড কানু সান্যাল প্রমুখ অন্যতম।

এবার ১৯৭৬ সালের কথা। পশ্চিম বাংলার নকশাল আন্দোলন প্রায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই কারাগারে। দিল্লী-কোলকাতার শাসক গোষ্ঠী ছাড়াও কম্যুনিষ্ট-

অকম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, ঠিক এমনি সময়ে এক ভয়াবহ সংবাদে সমগ্র ভারতে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। ১৯৭৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী। দূর্গের মতো সুরক্ষিত এবং সহস্রাধিক কারারক্ষীর নজর এড়িয়ে প্রেসিডেন্সী জেল ভেঙ্গে নকশাল নেতৃবৃন্দ ভাগোয়াট। প্রেসিডেন্সী জেল ভাঙ্গার মাস্টার প্ল্যান–এর মূল নায়কের নাম কমরেড আজিজুল হক। ক্ষীণ দেহ এবং চেহারার আদল নেতা চারু মজুমদারের কাছাকাছি। প্রেসিডেন্সী জেল ভাঙ্গার সময় অন্যান্য কমরেডদের পলায়ন সম্পন্ন হবার পর, সর্বশেষ পলাতক হিসেবে যেভাবে কমরেড হক কারারক্ষীদের গুলিবর্ষণের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় উধাও হোতে সক্ষম হন, তা ছিলো রীতিমত অবিশ্বাস্য। অচিরেই আজিজুল হক পরিণত হোলেন রূপকথা নায়ক হিসেবে।

কমরেড আজিজুল হক এবং কমরেড নিশীথ ভট্টচার্জির পরামর্শে ''পলায়নী মনোবৃত্তি'' ও ''কিঞ্চিৎ সংশোধনবাদীদের'' বাদ দিয়ে ১৯৭৭–এ তৈরী হলো দ্বিতীয় সেন্টাল কমিটি। এককালীন বেশ কিছু সংখ্যক বিপ্লবী নেতা বাদ পড়লেন এই ২য় সেন্ট্রাল কমিটি থেকে। এরই প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো গোয়েন্দাদের চোখে ধূলো দিয়ে নিউ জলপাইগুড়িতে। পার্টির থিসিস–এর সঙ্গে একমত হোতে ব্যর্থ হোয়ে কমরেড শান্তি পাল এবং কমরেড মহাদেব মুখার্জীর মতো নেতারা বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু কিছুতেই কমরেড আজিজুল হক স্বীয় বিশ্বাস থেকে পশ্চাদপসারণ হোলেন না। বিহারের অর্জুন ব্যানার্জি, কৃষ্ণনগরের রমেন সাহা এবং মালদার অনিল রায়কে সঙ্গে কোরে একটার পর একটা হিংসাত্মক কাজে ঝাঁপিয়ে পোড়লেন। এরই ফলে সংগঠিত হলো পশ্চিম দিনাজপুরে বন্দুক লুঠ, কোলকাতার সিপিএম অফিসে বোমা নিক্ষেপ, ঐতিহাসিক নদীয়া বন্দ, জনতা পার্টির নেতা কাশীকান্ত মৈত্র অপহরণ এবং বিহার অঞ্চলে ধংসাত্মক কর্মকান্ড।

এদিকে কমরেড চারু মজুমদারের কারাগারে মৃত্যুর পর প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ পার্টিকে অনেক ক'টা উপদলে বিভক্ত কোরেছিলেন। শেষ অবধি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে উপদলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টিতে। নকশালবাদীদের তখন ভয়াবহ দু'র্দিন আর সিপিএম–এর প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ কোরে জ্যোতি বসুর সিপিএম সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাশীন। ক্ষমতা লাভের পর ঠিকঠাক মতো সব কিছু গুছিয়ে নিতে আরো বছর আড়াই–এর মতো সময় পার হোয়ে গেলো। ১৯৮০ সালে এসে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সিপিএম সরকার রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদান করলো। সুদীর্ঘকাল পরে অন্যান্যদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন সেই–ই কমরেড আজিজুল হক।

ভদ্রলোক ছাড়া পেয়েই ঝিমিয়ে পড়া নকশাল আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার কোরলেন। দলে দলে পুরানো কর্মীরা এসে হাজির হলো নতুন দিক নির্দেশনার জন্য। তিনি একত্র কোরলেন কমরেড নিশীথ ভট্টাচার্জি, কমরেড রমেন সাহা, কমরেড কিশলয় ব্রক্ষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে। ঘোষণা কোরলেন নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির এবং ৪টি জেলায় গঠন কোরলেন পাল্টা বিপ্লবী সরকার। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির পরিষ্কার বক্তব্য হোচ্ছে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যুগের অবসান হোয়েছে। এখন হোচ্ছে সর্বহারাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। তাই ১৯৮২ সালে সাধারণ নির্বাচনকে বানচাল কোরতেই হবে।

এখানেই শেষ নয়। শেষ অবধি এই পুনর্গঠিত নকশালরা আকস্মিকভাবে অপহরণ করলো পশ্চিম বাংলার বিরোধী দলীয় নেতা জনতা পার্টির কাশী কান্ত মৈত্রকে। সারা

ভারতব্যাপী দারুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। নকশালদের কর্মকান্ডের এবার বিহার ও অনধ রাজ্যে বিস্তৃতি ঘটলো।

এরপরে ১৯৮২ সালের আরও কিছু কথাবার্তা। ২৫শে মে হোচ্ছে নকশালবাড়ি দিবস। এই দিবস উপলক্ষে বিহারের সিবান জেলার এক অখ্যাত গ্রাম সতবারিতে আয়োজন করা হলো আত্মগোপনকারী নকশাল নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকের। উপস্থিত হোলেন বহু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। আলোচনার শেষ পর্যায়ে সেই গ্রামে হলো পুলিশী হামলা। সবাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উধাও হোয়ে গেলেন। কিন্তু একটি বাস ষ্টেশন থেকে পরিচয়বিহীন এক বাঙালি যুবককে পুলিশ ''চোর'' সন্দেহে গ্রেফতার কোরে রাখলো থানা হাজতে। এ সময় কোলকাতার ভয়ংকর প্রকৃতির গোয়েন্দা অফিসার রজত মজুমদার নকশালদের পিছু নিয়ে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হন্যে হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভদ্রলোক সিবান জেলা শহরের থানা হাজতে এসে সেই বাঙালি 'চোরকে' সনাক্ত কোরলেন। ইনিই হোচ্ছেন প্রখ্যাত নকশাল নেতা কমরেড নিশীথ ভট্টাচার্জ। এই কমরেড ভট্টাচার্জ ছিলেন ৭০ দশকের একেবারে গোড়ার দিকে সিপি আই (এম–এল)–এর সাধারণ সম্পাদক। তখন ছিলো পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকের রায়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল রির্জাভ পুলিশের ভয়াবহ ''নকশাল নিশ্চিহ্নের অভিযান।''

এদিকে জাঁদরেল গোয়েন্দা অফিসার রজত মজুমদার গোপন তথ্য আদায়ের জন্য কমরেড নিশীথ ভট্টাচার্জর উপর শুরু কোরলেন অকথা দৈহিক অত্যাচার। একটানা ৯৪ ঘন্টা ঘুমাতে না দিয়ে আটক কমরেডের কাছ থেকে যে জবানবন্দী ১৯৮২ সালের ১৬ই জুন আদায় করা হলো, তা টেপ কোরে অন্যান্য আটক বন্দীদের শোনানো হোলে কারাগারে নকশাল নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৃষ্টি হলো তুমুল বিতর্কের।

কিন্তু কমরেড আজিজুল হকের বক্তব্য একটাই। কমরেড নিশীথ ভট্টাচার্জ একজন পরীক্ষিত নেতা এবং সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় দলের প্রতি ''বিশ্বাসঘাতকতা'' কোরতে পারেন না। এসবই হোচ্ছে পুলিশের চালাকি।

১৯৮২ সালের ২৮শে জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হলো আরও এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। খড়দহ এলাকার ছোট্ট একটি ছাপাখানায় সিপিএম সরকারের পুলিশ আকস্মিকভাবে হামলা চালালো। এই প্রেসেই ছাপা হতো নকশালদের মুখপত্র 'দেশব্রতী'। প্রেসের কম্পোজিটার ও মেশিনম্যানদের প্রথমে ধারণা হোয়েছিলো যে, পুলিশ হয়তোবা ছাপানো 'দেশব্রতী'র সমস্ত কপি 'সিজ' কোরতে এসেছে। কিন্তু তারা কোন কপি স্পর্শ পর্যন্ত করলোনা। সোজা যেয়ে প্রেসের একজন হ্যাংলা–দুবলা কর্মীকে গ্রেফতার করলো। প্রেসের অন্যান্য কর্মীরাও এই সর্বপ্রথম জানতে পারলো যে, গ্রেফতারকৃত মানুষটিই হোচ্ছেন রূপকথার নায়ক কমরেড আজিজুল হক। যিনি প্রায় ছয় বছর আগে প্রেসিডেন্সী জেল ভেঙ্গে সহযোদ্ধাদের নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সব ক'টি জেলের কারারক্ষীরা এই ক্ষীণদেহ নকশাল নেতা আজিজুল হকের নাম শুনেই কম্পমান। ডান্ডা–বেড়ী পরিয়ে তাঁকে জেলে আটক রেখে পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার রাজ্য সরকার একটার পর একটা হত্যা ও লুণ্ঠনের মামলা দায়ের করলো তাঁর বিরুদ্ধে। কমরেড আজিজুল হক নিজেই জানেন না যে, তাঁর বিরুদ্ধে সর্বমোট কতগুলো মামলা দায়ের করা হোয়েছে। এসবের জের হিসেবে সবার অজান্তে একটা সুদূর প্রসারী কান্ড হোয়ে গোলো। জেলের ভেতর ও বাইরে বিপুলসংখ্যাক নকশাল কর্মীদের এধারণাটা

বদ্ধমূল হলো যে, কমরেড আজিজুল হকই হোচ্ছেন সাচ্চা নকশাল নেতা এবং একমাত্র ইনিই নকশালদের সবগুলো উপ-দলকে একদলে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। দ্বিতীয় দফায় সিপিএম-এর কারাগারে কমরেড হকের কারাজীবন ১৯৮৯ সালে এসে প্রায় সাত বছর অতিক্রম কোরতে যাচ্ছে।

এবার ১৯৮৯ সালের কথা। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৯ সাল। সময়ের দূরত্বে প্রায় ১৭ বছরের মতো। মহাকালের গর্ভে এক এক কোরে এই ১৭টি বছর বিলীন হোয়ে গেছে। কিন্তু এই বছরগুলোতে নকশালদের কেন্দ্র করে কতো যে রক্তাক্ত ঘটনা সংঘটিত হোয়েছে, তার সঠিক ইতিহাস কে-ই বা লিপিবদ্ধ কোরে রাখবে?

একদিকে নকশালী হামলায় গ্রামীণ এলাকায় নিরীহ গৃহস্থ-জোতদার হত্যা ও বাড়ীঘর লুঠ;এবং অন্যদিকে সিআরপি সশস্ত্র পুলিশ আর সিপিএম ক্যাডারদের হাতে বেপরোয়াভাবে নকশাল নিধন। ফলে কত মাতার কোল শূন্য হয়ে গেলো এবং কত নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেলো তা হিসেব কোরে কেউ-ই বলতে পারবে না।

কিন্তু তবুও কথার পিঠে কথা থেকে যায়। এতোসব কর্মকান্ড সত্ত্বেও কি নকশালবাদী আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে?

জবাবটা সুস্পষ্টভাবে ''না।''

১৯৮৯ সালে নকশালদের সার্বিক অবস্থাটা পর্যালোচনা করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। এখন জেলের বাইরের কথাবার্তা। নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং রক্তাক্ত ইতিহাস অতিক্রম কোরে পশ্চিম বাংলা এবং বিহার রাজ্যে নকশালপন্থীদের আন্দোলন এখন নিম্নোক্ত ৩টি স্রোতে প্রবাহিত ঃ

ক) সন্তোষ রাণা-সত্যনারায়ণ সিং গ্রুপ (ঝাড়খন্ডের বিচ্ছিন্নবাদী এবং ঘিসিং-বিরোধী উগ্রপন্থী গুর্খারা এঁদের সমর্থক)

খ) ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট (নাগভূষণ-বিনোদ মিশ্র গ্রুপ)

গ) আজিজুল হক গ্রুপ।

প্রথম ২টি উপদল উগ্র ধরনের কথাবার্তা বোললেও এতোগুলো বছর পরে মোটামুটিভাবে সংসদীয় রাজনীতিতে আস্থাভাজন হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান কোরেছে।

প্রথমে গ্রুপের নেতা একদা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র কমরেড সন্তোষ রানার জন্ম মেদেনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায়। বিধানসভা নির্বাচনে কমরেড রানা নকশাল প্রার্থী হিসেবে একবার এখান থেকেই নির্বাচিত হোয়েছিলেন। কিন্তু পরবতী নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থীর নিকট পরাজয় বরণ কোরেন। এরপর গত কয়েক বছর ধোরে এই এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্যে উপজাতীয় 'বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝাড়খন্ড আন্দোলন'-এ মদদ জুগিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি কমরেড রানা দার্জিলিং এলাকায় সুভাষ ঘিষিং-বিরোধী উগ্রপন্থী গুর্খা নেতা ছত্রে সুব্ব-এর সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকের পর আঁতাত গড়তে সক্ষম হোয়েছেন। ফলে কমরেড সন্তোষ রানা এখন নতুন এলাকা দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কুচবিহারে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হোয়েছেন।

নকশালবাদী দ্বিতীয় গ্রুপ-এর নাম ইন্ডিয়ান পিপল্স ফ্রন্ট। সংক্ষেপে ''আই পি এফ''। মুল নেতৃত্ব কমরেড নাগ ভূষণ পট্টনায়েক (ওড়িষ্যা) এবং কমরেড বিনোদন মিশ্রের (বিহার) হাতে। এঁদের কর্মক্ষেত্র বিহার, পশ্চিম বঙ্গ, ওড়িষ্যা এবং অনধ্র রাজ্যে। মূলতঃ ভূমিহীন

কৃষকদের সমর্থনে সৃষ্ট এই উপদল সম্প্রতি অনেক ক'টা ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দখলে সক্ষম হোয়েছে। এঁরা আগামী সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে এঁদের কর্মপন্থা নির্ধারণ কোরতে যাচ্ছেন।

গেলো বছর ১৯৮৮ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আই পি এফ–এর ৩য় জাতীয় সম্মেলনে (২০–২৩ মার্চ) ভারতের ১১টি রাজ্যর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় এঁদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পরিলক্ষিত হোচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমরেড অরিজিৎ সিং এবং কমরেড বাসুদেব বসুর নেতৃত্বে আই পি এফ মূলতঃ ছাত্র,যুব,শ্রমিক এবং পেশাজীবী ফন্টে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন কোরেছে। নেতৃত্ব পর্যায়ে এঁদের সবচেয়ে বড় লাভ হোচ্ছে এককালের কমরেড আজিজুল হকের ঘনিষ্ঠ সহককর্মী নদীয়ার কমরেড রমেন সাহার যোগদান। অবশ্য কিছুদিনের ব্যবধানে পুলিশ এই প্রাক্তন বিপ্লবীকে একটি রাইফেল ছিনতাই–এর অভিযোগে গ্রেফতার কোরেছে। জেলখানায় সাংবাদিক সাক্ষাতকারে কমরেড রমেন সাহা এক অর্থবহ বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বোলেছেন যে, ''জ্যোতি বসুর সিপিএম রাজ্য সরকার পুলিশ দিয়ে এইভাবে যদি অন্যায় হামলা চালায়, তাহলে আমরা আবার রাইফেল হাতে তুলে নেবো।''

এরই পাশাপাশি চলতি বছরের ৭ই জানুয়ারি কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আদি নকশালপন্থীদের প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোয়েছে। সম্মেলনে ৭০ দশকের তিনজন জাঁদরেল নেতা যথাক্রমে কমরেড কানু সান্যাল, কমরেড অসীম ব্যানার্জি আর কমরেড সৌরীন বসু একই মঞ্চে হাজির হোলেন। এই দফায় এঁদের কন্ঠে এতোগুলো বছরের ''রক্তাক্ত বিপ্লবের'' কথাবার্তা অনুপস্থিত। এঁদের বক্তব্যে অনুশোচনার সুর। এঁরা বোললেন, ''খতমের রাজনীতি'' অবশ্যই নিন্দনীয়।

কোলকাতার সিপিএম সরকারের নেতৃবৃন্দ এসব কথাবার্তায় চমকে উঠেছেন। সামনে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনকে উপলক্ষ কোরে যদি নকশালপন্থী সন্তোষ রানা গ্রুপ এবং আই পি এফ উপদলের সংগে কানু–সৌরীন উপদল একই মোর্চায় যোগ দিয়ে ''তৃতীয় ফ্রন্ট'' গঠন কোরে তাহলে উপায়?

আসন্ন নির্বাচনে জ্যোতি বসুর সিপিএম পার্টির রাজ্য পরিষদে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ এই প্রথমবারের মতো ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হোতে যাচ্ছে। সিপিএম নেতৃবৃন্দ ভাবতেই পারেননি যে, কমরেড চারু মজুমদাররের এককালীন সহকর্মীরা এভাবে ''রক্তাক্ত বিপ্লবের'' পথ পরিহার কোরে সংসদীয় রাজনীতিতে আস্থাভাজন হবেন? দিল্লীর রাজীব সরকার কি অত্যন্ত সন্তর্পণে এ ব্যাপারে মদত্ জুগিয়েছেন? কিন্তু প্রমাণ কোথায়?

এ ধরনের এক উত্তেজনাকর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এখন দেখা যাক কারাগারে আটক এবং নকশাল কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা কমরেড আজিজুল হকের চিন্তাধারার কোন পর্যায়ে?

কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণে গত ৭ই জানুয়ারি ১৯৮৯ যখন কানু–অসীম–সৌরিনদের নেতৃত্বে নকশালদের প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো, তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ১০ নং 'কনডেমড সেল–এ' ডান্ডা–বেড়ী পায়ে সুদীর্ঘ ৭ বছর ধোরে আটক কমরেড আজিজুল হক। কোলকাতা এবং দিল্লী সরকারের চোখে সমগ্র ভারতবর্ষের সবচেয়ে 'বিপদজ্জনক' নকশাল নেতা এই কমরেড আজিজুল হক। মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি

বসুর নির্দেশে গেলো জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অসুস্থ কমরেড হককে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় নিয়ে আসা হলো নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

সিপিএম নেতৃবৃন্দের হিসেবটা হোচ্ছে, কমরেড হক সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বোলবেনই এবং এসব কথাবার্তা নিশ্চিতভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী হোতে বাধ্য। উপরন্তু সম্প্রতি যেসব নকশাল নেতৃবৃন্দ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হোয়ে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করায় সিপিএম-এর জন্য ভীতির কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছে, কমরেড আজিজুল হক অন্ততঃ আদর্শগত কারণে তাঁদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা কোরবেন।

হাসপাতালের বিছানায় বসে সবচেয়ে 'বিপদজ্জনক' নকশাল নেতা কমরেড আজিজুল হক সাংবাদিকদের কাছ থেকে নিবিষ্ট মনে কানু-অসীম-সৌরীনের নতুন সংশোধনবাদী বক্তব্য শুনে বিস্মিত হোলেন। জবাবে বোললেন—

বিপ্লবীরা বিপ্লব কোরে, আত্মদান কোরে; আর গাছ তলায় বসে পাকা ফল ভোগ কোরে সংশোধনবাদীরা……। যাঁরা সংসদীয় রাজনীতির চোরাবালির ফাঁদে আটকে পড়েছেন, তাঁদের কেউ যাচ্ছেন ঝাড়খন্ডীদের সঙ্গে, কেউ বা গোর্খাফ্রন্টের সঙ্গে। তাই এখন বোধ হয় নকশাল আন্দোলনের স্রষ্টা চারু মজুমদারকে বাঁচাতে হবে ইদানীংকার চারু মজুমদার পন্থীদের হাত থেকেই।''

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে পূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলোর রাজনীতি এখন এক নতুন পর্যায়ে উপস্থিত হোয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য অর্থাৎ সপ্তকন্যার ছ'টি কন্যা এখন রাজীব কংগ্রেসের কুক্ষিগত। অবশিষ্ট কন্যা আসাম রাজ্যের অকংগ্রেসী সরকার একেবারে 'নড়বড়ে'। উপজতীয় টি, এন, ভি'র সমর্থনে ত্রিপুরার সিপিএম সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর এখন রাজীব-কংগ্রেসের শ্যেন দৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গের উপর। জ্যোতি বসু সরকার সমর্থকদের মতে তথাকথিত 'বঙ্গভূমি' আন্দোলনও হোচ্ছে দিল্লীর মদতপুষ্ট।

দিল্লীর রাজীব সরকার আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিম বঙ্গে সিপিএম সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদগ্র বাসনায় এখন নকশালপন্থী সংশোধনবাদীদের দিয়ে একটা শক্তিশালী 'তৃতীয় ফ্রন্ট' গঠনে আগ্রহী।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতৃবৃন্দের কথা হোচ্ছে, যেভাবেই হোক এই প্রস্তাবিত তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন কোরতে দেয়া হবে না। যদিওবা তৃতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়, তবুও এটা যাতে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী না হয়,তার পদক্ষেপ নিতে হবে।

আর এজন্যই আদর্শগতভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র বিরোধী এবং সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক নকশাল নেতা কমরেড আজিজুল হককে ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে বিপুল সংখ্যক নকশাল কর্মী কমরেড হকের সমর্থনে এগিয়ে আসবে এবং এই সাচ্চা নকশাল নেতার কথাবার্তা ও কর্মকান্ডে প্রস্তাবিত তৃতীয় ফ্রন্টের ভিত্তি দুর্বল হোতে বাধ্য। কথায় বোলে ''কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।''

বিষয়টি আশ্চর্যজনক হোলেও সত্য যে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এক চাঞ্চল্যকর অনুরোধপত্র লিখেছেন। এতে কমরেড আজিজুল হকের বিরুদ্ধে বিহার সরকার যেসব মামলা দায়ের কোরেছে সেসব মামলা উঠিয়ে নিতে বলা হোয়েছে।

এদিকে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে কমরেড আজিজুল হককে মুক্ত করার ''কৃতিত্ব'' গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হোচ্ছে। কংগ্রেসী নেতা ভোলা নাথ সেন ছাড়াও নকশালপন্থী বিশিষ্ট লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী ও শৈবাল মিত্র বিহার সরকারের কাছে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তির দাবি জানিয়েছেন। উপরন্তু কংগ্রেসী নেতা সুব্রত মুখার্জি ও অজিত পাঁজা প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কমরেড হকের মুক্তির আবেদন কোরেছেন। এরই পাশাপাশি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভাস্কর রায় চৌধুরী, কবি শংখ ঘোষ এবং চিত্র পরিচালক মৃনাল সেন প্রমুখ আজিজুল হকের মুক্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে স্মারকলিপি পেশ কোরেছেন।

হায়রে, রাজনীতির কি অপার মহিমা! দিল্লীর রাজীব সরকার 'তৃতীয় ফ্রন্ট' গঠনের লক্ষ্যে এক্ষণে ''সংশোধনবাদী নকশালপন্থীদের'' মদত দিচ্ছে; আর প্রস্তাবিত 'তৃতীয় ফ্রন্ট'কে দুর্বল করার স্ট্রেটেজী হিসেবে কোলকাতার সিপিএম সরকার 'বিপজ্জনক' নকশাল নেতা কমরেড আজিজুল হককে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

জেলে বীভৎস পুলিশী অত্যাচারের
শিকার কমরেড আজিজুল হক
–শুভাশিস মৈত্র

জেলে বীভৎস পুলিশী অত্যাচারের শিকার কমরেড আজিজুল হক

–শুভাশিস মৈত্র

নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা আজিজুল হককে অবশেষে জেল হাতপাতাল থেকে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেন্টিনারি বিল্ডিং-এর পাঁচ তলার একটি ব্লকের সমস্ত কেবিন এবং ঘর খালি করে একটি বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে আজিজুলকে। দীর্ঘ করিডোরে লম্বা কাঠের বেঞ্চ পেতে ব্যরিকেড তৈরি করে সার বেঁধে বসে আছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। শাদা পোষাকের পুলিশে ছেয়ে আছে হাসপাতাল।

যাঁকে ঘিরে এত ব্যবস্থা সেই আজিজুল হক অবশ্য একেবারেই হাঁটা- চলা করতে পারেন না। ভালো করে বসতে পারেন না। লেখার জন্য একটি কলম পর্যন্ত ধরতে পারেন না। তাঁর মুখ থেকে কথা আদায়ের জন্য হাতের আঙুলগুলো ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। এই রিপোর্ট যখন লেখা হচ্ছে (২-৯-৮৬), হাসপাতাল সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেল তাঁর শারিরীক অবস্থার খুবই অবনতি হয়েছে। সারা দিনে একটুকুও খাবার খেতে পারেন নি। ইউরিন বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁকে অক্সিজেন এবং স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তাররা অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁরা আশা করছেন রাতের মধ্যেই অবস্থার উন্নতি হবে।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রায় ১৬,০০০ মামলা তুলে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি দিয়েছিলেন। এটা ১৯৭৭ –এর কথা। সেই সময়েই অন্যান্য নকশালপন্থী বন্দীদের সঙ্গে আজিজুলও জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। নকশালপন্থী আন্দোলন ততদিনে অনেকগুলো ভাগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এবং বেশির ভাগ ছোট দলই চারু মজুমদারের 'বিপ্লবী তত্ত্ব'কে আর সঠিক মনে করছেন না। একমাত্র ব্যতিক্রম আজিজুলের সংগঠন। তাঁর দল দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি তখনও চারুমজুমদারের 'গেরিলা যুদ্ধের' তত্ত্ব, 'শ্রেণী শত্রু খতমের' তত্ত্বকে সঠিক মনে করে পশ্চিম বাংলার গ্রামে তার প্রয়োগ শুরু করলে ১৯৮২ সালে পুলিগ আজিজুলকে আবার গ্রেপ্তার করে।

আজিজুলের বিরুদ্ধে পুলিশের দেওয়া কেসের সংখ্যা মোট ৪৩টি। ১৯৮২ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে পুলিশ মোট ৬৪ জন নকশালপন্থী গ্রেপ্তার করে। ইন্টারোগেসনের জন্য পুলিশ আজিজুলকে দীর্ঘদিন টালিগঞ্জের 'রিট্রিট'-এ রেখেছিল। এই সময়ই আজিজুলের হাতের আঙুলগুলো ভেঙে দেওয়া হয় যাতে তিনি কখনও কলম ধরতে না পারেন।

আজিজুল বলেছেন তাঁকে চিকিৎসার নাম করে কয়েকবার ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে নষ্ট করে দেওয়া। বর্তমানে যে মেডিক্যাল বোর্ড তাঁর চিকিৎসা করছেন তিনি সেই বোর্ডকেও এই ইলেকট্রিক শক-এর বিষয়টি জানিয়েছেন। বোর্ড এই প্রসঙ্গে কতগুলো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও নিতে চলেছে।

টালিগঞ্জের 'রিট্রিট' নামের এই বাড়িটি কলকাতা পুলিশের একটি অতি আধুনিক 'টর্চার চেম্বার'। এখানে নকশালপন্থীদের দীর্ঘসময় ধরে রেখে ইন্টারোগেসন করা হয়। আজিজুল ছাড়া অন্য যে নকশালপন্থী বন্দীকে এখানে রাখা হয়েছিল তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বিশ্বনাথের একটি ফুসফুস এবং বুকের পাঁজরের ৮টি হাড় নেই। ভয়ঙ্কর অসুস্থ অবস্থায় বিশ্বনাথ এখন পিজি হাসপাতালে আছেন। সম্ভবত তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে আর ফিরিয়ে

আনা যাবে না। অথচ এই সব নকশালপন্হী বন্দীদের প্রসঙ্গে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এঁরা সবাই বিচারাধীন বন্দী।

৬৪ জন বন্দী নকশালপন্হীর মাত্র তিন জনের বিচার হয়েছে। আজিজুল গত চার বছর বিচারাধীন অবস্থায় বন্দী আছেন। গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করেন এমন একজন আইনজীবী এম এ লতিফ সম্প্রতি 'পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি-র' এক মিটিং-এ বলেছেন, বিচারধীন বন্দীদের এইভাবে দীর্ঘদিন আটকে রাখা ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী। তাঁর মতে এই কাজ সংবিধানের ১৪, ১৯ এবং ১২১ ধারার পরিপন্হী।

জুলাই(১৯৮৬) মাসের প্রথম সপ্তাহে 'ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টের' একটি প্রতিনিধি দল আলিপুর জেলে আজিজুলের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আজিজুল তাদের জানান , তিনি ভয়ঙ্করভাবে অসুস্হ । কিন্তু এখানে তাঁর কোনো রকম চিকিৎসাই হচ্ছে না। চিকিৎসার নাম করে তাঁকে বার বার এক জেল থেকে অন্য জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । তিনি আরো জানান যে, তিনি কখনই আশা করেন না যে সরকার প্রকৃতই তাঁর চিকিৎসা করতে আগ্রহী। আজিজুল বলেন, তিনি কোনো অবস্হাতেই জামিন নেবেন না। তাঁর প্রয়োজন সম্পূর্ণ শারিরীক ও মানসিক শান্তি, যা জেলে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি দাবি করেন, হয় তাকে বাকি ৬৩ জন বন্দীসহ নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হোক অথবা তাকে প্যারোলে ছাড়া হোক।

এই প্রসঙ্গে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং সিপিআই(এম)-এর পার্টি সেক্রেটারী সরোজ মুখার্জি সাংবাদিকদের জানান, কোনো অবস্থাতেই কোনো বন্দীকে প্যারোলে ছাড়া হবে না। জেলখানাতে বা হাসপাতালেই চিকিৎসার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্য সরকার এটাও জানিয়েছিল যে, জামিন নিতে পারেন।

পরে আজিজুল হক একটি প্রশ্নের উত্তরে এই রিপোর্টারকে জানান, ''জামিন নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোনো বিপ্লবীর পক্ষেই জামিন নেওয়া সম্ভব নয়।'' পরে হাসতে হাসতে বলেন, ''হিউম্যান বন্ডেজ ছাড়া আর কোনো বন্ডেজ আমি মানতে নারাজ।'' অন্যদিকে আরো একটি প্রশ্ন এই সময়ে ওঠে, তা হল আজিজুল সহ অন্যান্য নকশালপন্থী বন্দীরা রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাবেন কিনা। এই প্রসঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষ জানান জেল কোডে রাজনৈতিক বন্দী বলে কিছু নেই ।

এই সময়ে একটি ঘটনা আর এস পি নেতাদের অত্যন্ত চিন্তিত করে তোলে। ''জেলে যদি আজিজুলের মৃত্যু হয় তার সম্পূর্ন দায় আপনাদের দলের উপর বর্তাবে। ফ্রন্টের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কিন্তু আপনারা বাচাঁতে পারবেন না। নির্বাচনের আর খুব একটা দেরি নেই। আজিজুলের মৃত্যু হলে তার একটা প্রতিক্রিয়া হবেই।" এই যুক্তিতে আর এস পি নেতারা চিন্তিত হয়ে ওঠেন। এবং আর এস পি-র দুজন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এবং দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জেলে আজিজুলকে দেখতে ছুটে যান। তাঁরা আজিজুলকে অনুরোধ করেন তিনি যেন জেল হাসপাতাল থেকে সরাসরি হাসপাতালে আসতে সম্মত হন এবং চিকিৎসা গ্রহন করেন। আজিজুল তাঁদেরকেও সরাসরি বলেন, তিনি সরকারি হাসপাতালে যাবেন না এবং সরকারি চিকিৎসা গ্রহন করবেন না। অন্যদিকে জেল হাসপাতালে ডাঃ ঠাকুর এবং ডাঃ সামন্ত ক্রমাগতই আজিজুল হকের স্ত্রী মনি দীপা সাঈদাকে অনুরোধ করে যাচিছলেন, তিনি যেন আজিজুলকে সরকারি হাসপাতালে চলে যেতে রাজি করান। ঐ দুজন ডাক্তারের বক্তব্য ছিল শুধু অক্সিজেন সিলিন্ডার আর স্যালাইন দিয়ে এত ভয়ঙ্কর ভাবে অসুস্থ কোনো রুগীকে সারিয়ে তোলা যায় না। কারন নুন্যতম জীবনদায়ী ঔষধপত্রও জেলে কখনই থাকে না।

কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য আজিজুলকে প্যারোলে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব ফ্রন্ট অগ্রাহ্য করেছে। অসুস্থতার কারণে আজিজুলকে প্যারোলে ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে 'পিপলস্‌ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি ' সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। সরকারি পক্ষের উকিল এই অনুরোধের বিরোধিতা করে আদালতকে জানান যে, সরকার আজিজুলের চিকিৎসার জন্য চারজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করেছেন এবং ঐ বোর্ডেই আজিজুলের চিকিৎসার ভার নিয়েছে। ফলে আজিজুলকে প্যারোলে ছেড়ে দেবার কোন যুক্তি নেই। প্রধান বিচারপতি সতীশ চন্দ্র এই যুক্তি মেনে নিয়ে সিভিল লিবার্টি সংগঠনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন।

যদিও আজিজুল হক প্রায় এক মাস ধরে ক্রমাগত বলে এসেছিলেন তিনি সরকারি চিকিৎসা নেবেন না। কিন্তু শেষ অবধি আগষ্ট–এর (১৯৮৬) ১১ তারিখে তিনি স্বেচ্ছায় জেল হাসপাতাল থেকে চলে এলেন নীলরতন সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে; যদিও তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় হাসপাতালে স্থানান্তরের সময় তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে ডাঃ সামন্ত এবং ডাঃ ঠাকুর তাঁকে ষ্ট্রেচারে তুলতে অস্বীকার করেন। কিন্তু জেলের সুপার এবং জেলার নিজেদের কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামিয়ে ফেলার উৎসাহে ঐ অবস্থাতেই আজিজুলকে জেল থেকে নীলরতনে পাঠিয়ে দেন।

পরে যখন আজিজুল হককে 'জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি প্রথমে সরকারি চিকিৎসা নেবেন না বলেছিলেন এতদিন ধরে; এখন মত বদলানোর কারন কি? উত্তরে আজিজুল বলেছিলেন," রাজ্য সরকার এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছেন যেন সত্যিই তাঁরা আমার ঠিকমত চিকিৎসা করতে আগ্রহী। আমি নিচ্ছিনা বলেই তা সম্ভব হচ্ছে না। এটা আসলে সাধারনের চোখে ধূলো দেওয়া। চিকিৎসা করার ইচ্ছে থাকলে ওঁরা অনেক আগেই তা করতে পারতন। আমি সেটাই প্রমান করবার জন্য ওঁদের কথা মেনে নিয়েছি। আপনি বোর্ডের ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করুন না এখানে কি হচ্ছে, ওঁরাই বলবেন।"

অন্যদিকে চারজনের মেডিক্যাল বোর্ডও দু'ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ অবনী রায় চৌধুরী, তাঁর বিশ্বাস নীলরতনে পুলিশ পাহারায় আজিজুলের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্ভব। অন্যদিকে আছেন ডাঃ অরুন ব্যানার্জী,ডাঃ অজয় মিত্র এবং ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী। এরা ঠিক উল্টোটা মনে করেন। তাঁরা মনে করেন আজিজুলের মানসিক শান্তি ও বিশ্রাম প্রয়োজন। যা এখানে একেবারেই সম্ভব নয়। এখানে আজিজুল চোখ খুললেই দেখতে পান খাকী এবং শাদা পোশাক পরা পুলিশ। তিনি প্রায়শই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এ ধরনের উত্তেজনার ফলেই সম্ভবত এখানে আসার পর বেশ কয়েকবার তিনি রক্তবমি করেছেন। ডাক্তাররা এ বিষয়টি ইতিমধ্যে মন্ত্রীকেও জানিয়েছেন।

আজিজুলের অসুস্থতা সম্পর্কে ডাক্তারের লোমহর্ষক বিবৃতি

১৯৮৬ সালের ১১ই আগষ্ট মুমুর্ষ অবস্থায় বিচারাধীন নকশাল নেতা কমরেড আজিজুল হককে চিকিৎসার জন্য পুলিশ প্রহরায় আলিপুর জেল থেকে কলকাতার নীলরতন মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমরেড হকের একজন ডাক্তার অসুস্থতার যে বিবরণ দিলেন, তা' রীতিমত লোমহর্ষক।

'' ওর (কমরেড আজিজুল হক-এর) অসুখ একটা নয়। গত এক মাসের উপর শয্যাশায়ী। বসতে বা দাঁড়াতে পারেন না, এতই দুর্বল। সারা শরীর অসম্ভব কাঁপে সবসময়। সেইজন্য কিছু ধরতে বা দাঁড়াতে অসুবিধে হয়। পেটে একটা ব্যাথা আছে। কারণ বোঝা যাচ্ছে না। পেটে বড় সেলাই-এর দাগ রয়েছে। ১৯৭৩-এ যখন আন্ডার গ্রাউন্ডে ছিলেন, তখন একটা অপারেশন নাকি হয়েছিল স্টমাকে। সেলাই-এর দাগটা সম্ভবত তারই। ঐ অপারেশন করেছিলেন ডাঃ এস এম দাস। তিনি এখন মেডিক্যাল কলেজে আছেন। ডাঃ দাসকে আমরা ডেকেছি। সেই সময়ের কেস হিস্ট্রি জানবার জন্য।

''আজিজুল হকের প্রস্রাবের সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। ক'দিন অবশ্য এটা একটু বন্ধ আছে। এসবের কারণ বোঝা যাচ্ছে না এখনও। প্রায় রোজই রক্ত বমি হচ্ছে। মাঝে মাঝে রক্তচাপ সাংঘাতিক নেমে যাচ্ছে। তখন স্যালাইন প্রয়োজন হয়। জেলের ভিতর কি কি হয়েছে আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল। তবে এগুলো 'ম্যালনিউট্রিশনের' জন্য হচ্ছে না। তার চেয়ে অনেক 'সিরিয়াস' কিছু কারণ আছে।

''আজিজুল আমাদের বলেছেন, জেলে ওঁর উপর অত্যাচার করা হয়েছে। ওঁর স্ত্রী আমাদের বলেছেন ১৪ কিলো ওজন নাকি কমে গেছে গত কয়েক মাসে। টর্চার থেকে এগুলো হতে পারে। তবে এখনই চূড়ান্ত ভাবে বলা মুশকিল। এখনও তো ওঁর রোগ 'ডায়াগনসিস্' হয়নি। এগুলো সবই 'সিম্‌পটম'। প্রসেস চলছে। ক্লিনিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট গুলো এখনও হাতে পাইনি আমরা। আজিজুল আমাদের বলেছেন ওঁকে ইলেকট্রিক শক্ দেয়া হয়েছে। তার জন্যও এসব হতে পারে। কিন্তু তা এখনই নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল।

''ইলেকট্রিক শক্ দেয়া হয়েছিল কিনা এটা 'ক্লিনিক্যালি' বোঝার জন্য নিউরোলজিস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মেডিক্যাল বোর্ডে কোন নিউরোলজিস্ট নেই। হয়তো ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্যামল সেনকে এই বিষয়ে পরামর্শের জন্য ডাকা হবে। নিউরোলজিস্ট হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আমরা কারা মন্ত্রীকে (কমরেড দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়) এসব জানিয়েছি।

''আপাতত আমরা আজিজুলকে 'ওয়াকার' দিয়েছি। ওঁকে 'ওয়াকার দিয়ে একটু একটু করে হাঁটার চেষ্টা করাচ্ছি। জেলেই 'ওয়াকার' দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তা দেয়া হয়নি। এখন নীলরতন হাসপাতালে তা দেয়া হলো। আজিজুল হকের চোখ খুবই খারাপ। ওঁর চিকিৎসার জন্য একজন 'আই স্পেশালিস্ট' এবং একজন 'ফিজিক্যাল মেডিসিনের' ডাক্তারের আমাদের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর বেশী এখন বলা সম্ভব নয়।''

পাক্ষিক প্রতিক্ষন — এর সঙ্গে
আজিজুল হকের কথাবার্তা

প্রশ্ন ঃ আপনাকে চিকিৎসার নাম করে ইলেকট্রিক শক্ দেওয়া হয়েছে - ইলেকট্রিক হিটারে পায়ের তলা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ঘটনাগুলো কতদূর সত্যি?

উত্তর ঃ এগুলো হয়েছে, কিন্তু পুলিশের অত্যাচার নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলে আমি মানুষের মনে আতংক ছড়াতে চাইনা।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি জামিন পেতে ইচ্ছুক?

উত্তর ঃ 'বেইল' মানেই তো 'বন্ড'। কোন রকম শর্তাধীনে আমি মুক্তি চাইনা।

প্রশ্ন ঃ জেলে অসুস্থ অবস্থায় আপনার কি চিকিৎসা হয়েছিল? জেলে বইপত্র পেতেন?

উত্তর ঃ কোন চিকিৎসাই হয়নি। এ কথা তো এখন ডাক্তাররাই বলছেন ? আর বইপত্র? দমদম সেন্ট্রাল জেলে তাও এক–আধটা খাতা বই আনানো যেত, আলিপুর জেলে তো লেখার কলমও পাই নি। দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে যেদিন আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ট্রান্সফার করা হল, সেদিন আমার সেল থেকে সমস্ত বই এবং আমার প্রিয়জনদের ছবি সব পুলিশ নিয়ে নেয়। কিছুই আজও ফেরত পাই নি।

প্রশ্ন ঃ হাসপাতালে এখন আপনার প্রধান অসুবিধে কি?

উত্তর ঃ হাসপাতাল সম্পর্কে দুটো অসুবিধার কথা উঠতে পারে। এক, আমার ব্যক্তিগত অসুবিধে। ব্যক্তিগত কোন অসুবিধা নেই। জাহান্নামেও আমার কোন অসুবিধে হয়না। আর হাসপাতাল প্রশাসনের সম্পর্কে কোন অসুবিধার কথা? সেটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার। আমার চোখের সামনে সার বেধেঁ পুলিশ বসে থাকবে কিনা সেটা সরকারই ঠিক করবেন।

প্রশ্ন ঃ নকশালপন্থী বন্দীদের মুক্তির জন্য একটা চাপ সংবাদপত্র গুলো সৃষ্টি করতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই। গত চার বছর (১৯৮২–৮৩ থেকে ১৯৮৫–৮৬) ধরে তো কেউ জানতেনই না যে এতগুলো ছেলে বিভিন্ন জেলে বিচারাধীন অবস্থায় বন্দী হয়ে রয়েছে। সাংবাদপত্রের জন্যই জানতে পারলেন। 'আজকাল' পত্রিকাকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ । ওঁরাই এই আন্দোলনটা শুরু করেছেন। এরপর অন্যান্য সংবাদপত্রগুলোও ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা গৌরবের। আমার অবিভক্ত কমুনিষ্ট পার্টির স্বাধীনতা পত্রিকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি কোনো বই লিখেছেন বা লেখার ইচ্ছে আছে?

উত্তর ঃ এখন তো সম্ভব নয়। আমার হাতের আঙুলগুলো অকেজো হয়ে গেছে। ইনডেক্স–ফিঙ্গারটি স্টিফ হয়ে গেছে। আগের বেশ কিছু লেখা আছে। সেগুলো যদি বই হয় তবে বই, না করলে শুধুই লেখা। আর যদি আঙুলে আবার শক্তি ফিরে আসে, তখন আবার লিখব। লিখতে আমি ভালবাসি।

'যাদের সাথে জেল খেটেছি
এখন তাদের জেলেই আমি'
— কমরেড আজিজুল হক

'যাদের সাথে জেল খেটেছি
এখন তাদের জেলেই আমি'
— কমরেড আজিজুল হক

[বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের শোষিত জনগোষ্ঠির রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনেতিক মুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ কমরেড আজিজুল হক। রক্তাক্ত নকশাল আন্দোলনের ইতিহাসে প্রয়াত কমরেড চারু মুজুমদারের পর এক অবিস্মরণীয় নাম। মোট কারাজীবন প্রায় ১৮ বছরের মতো। বর্তমান দফায় ১৯৮২ সাল থেকে এক নাগাড়ে প্রায় ৭ বছর ধোরে ডান্ডবেড়ী পায়ে কমরেড জ্যোতি বসুর (সিপিএম সরকার) কারাগারে আটক এক অভিযুক্ত ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা মোট ৪৩টি। একদিকে স্বীয় মতাদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও ইস্পাত–কঠিন ব্যক্তিত্ব এবং অন্যদিকে একজন স্নেহশীল পিতা, প্রেমিক স্বামী ও সহযাত্রীদের প্রতি অকুন্ঠ ভালোবাসায় আপ্লুত এই আজিজুল হক ।

জেলে ভায়াবহ পুলিশী অত্যাচারে কমরেড আজিজুল এখন 'ওয়াকার' ছাড়া হাঁটতে অক্ষম; হাতের আংগুলগুলো ভেংগে দেয়ায় লেখনীতে তাঁর শ্লথ গতি এবং কয়েক দফা ইলেকট্রিক শকে দেহের সেন্ট্রাল নার্ভ সিষ্টেম খুবই দুর্বল। মাঝে মাঝে রক্ত বমি হয়। ফলে চিকিৎসার জন্য তাঁকে বছর খানেকের জন্য পুলিশ প্রহরাধীনে কোলকাতার নীলরতন মেডিক্যাল হাসপাতালে রাখতে হয়। এ সময় সাংবাদিকদের কাছে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হোচ্ছে,

''বিপ্লবীরা বিপ্লব করে, —আত্মদান করে; আর সংশোধনবাদীরা গাছতলায় বসে পাকা ফল ভক্ষন করে।''

হাসপাতাল থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফিরে আসার পর ১৯৮৭ সালের ১০ ই আগষ্ট থেকে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত ৫২ দিনের ব্যক্তিগত ডায়েরীর উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপিত করা হলো। এ থেকেই কমরেড আজিজুল হকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনুধাবন করা সম্ভব। ভবিষ্যতে গবেষকরাই বিচার কোরবেন, আজিজুল হকের লেখনীতে এটা কি শুধুমাত্র ডায়েরী– নাকি সাহিত্যের অংশবিশেষ?– সম্পাদক]

১০ই আগষ্ট ১৯৮৭ থেকে

এক বছর পর হাসপাতালে থেকে জেলে এলাম, হাসপাতাল থেকে একেবারে পাতালে। আমার 'ভাবনা' মতই ব্যাপারগুলো ঘটে চলছে। এই যে শুধু যাওয়া আর আসা এর মধ্যে 'স্রোতে ভাসা' ছাড়া আমার কোন ভূমিকাই ছিল না। থাকার কথাও নয়।

একটা পরিবর্তন অবশ্য লক্ষ্য করার মত। হাসপাতালে যাবার সময় সেটা চোখে পড়েছিল। এখন সে আশংকাটাই সত্যে পরিণত । আমি হঠাৎ 'স্যার' হয়ে গেছি ! ওই শব্দটা শুনলেই আমার গা চিড়–বিড় করে। এখন প্রত্যেককে ধরে ধরে বোঝাতে হচ্ছে 'আমি স্যার নই' এটা খবরের কাগজের অবদান, ওঁরা এমনভাবে আমাকে তুলে ধরেছেন যেন 'আগামী দিনের ভাগ্যবিধাতা' আমিই । কিম্বা 'আমিই এ হতভাগা বাংলাকে (পঃ বঙ্গ) বাঁচাতে এবং উদ্ধার করতে পারি।'

এটা ভালো জিনিশের খারাপ দিক। ফলে নিজের সাথে লড়াইটা আরও বেড়ে গেল। এ সংগ্রামে জিতে 'আমাকে আজিজুল, দ্য ক্রিমিনালই' থাকতে হবে, ওটাই আমার গর্ব।

হাসপাতালে থাকতে সব থেকে বড় লাভ যেটা হয়েছে বাবাই– তিন্নীর সাথে ঘনিষ্ঠতা। ওদের মাধ্যমে এ যুগের বাচ্চাদের বুঝতে চেষ্টা করেছি। ওদের অশেষ ক্ষতিসাধন করে চলেছি। আমাকে সুস্থ করতে গিয়ে ঝুমুর (স্ত্রী মনিদীপা সাঈদা) নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। আসার দিনে ওকে যে রকম আপ-সেট দেখলাম, এ রকমটা কোনোদিনও দেখিনি।

ধুনোর গন্ধ দিল বাবাই, ''মা, তুমি কাঁদছ কেন, এর কোনো মানে হয় না, আজ হোক, কাল হোক, বাবাকে তো জেলে যেতেই হবে।''বাবাইকে বুকে চেপে ধরে ঝুমুর একেবারে ভেঙে পড়ল।

বিশাল পুলিশ বাহিনীর সামনে নিজেকে ঠিক রখেতে আমি তিন্নীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ও এসবের ধার ধারে না, নিজেকে জাহির করতেই ব্যস্ত। ওর বক্তব্য শোনাতেই ও ব্যস্ত। না শুনে উপায় অছে! মাথার চুল ধরে এক হ্যাঁচকা টানে আমার উচ্চতাটা কমিয়ে দিল–'যেতে দিলে তো!'

আর পারলাম না সামলাতে। 'হায় রে মূঢ় মেয়ে, অবোধ শিশু ; তোর হৃদয়ের শক্তির চেয়ে, পশুশক্তি অনেক অনেক বড়। কি করে তাকে আটকাবি মা?'

একজন অফিসার এসে বললেন, 'স্যার, ইউ আর রেডি!'

অফিসারকে ঢুকতে দেখেই ঝুমুর নিজেকে সামলে নিল, চোখের জল মুছে হাসিমুখে বলল, 'ডোন্ট গেট আপসেট্, হু ইজ এ্যাফ্রেইড অব আজিজুল হক'? অফিসারটাকে দেখিয়ে দিলাম।

'আমার ধ্বংসে ফোটে যেন
হাজার রক্তের ফুল'

নীচে পুলিশের বেতার গাড়ি অনবরত হেড-কোয়াটারের কাছে নির্দেশ নিয়ে চলেছে, তার যান্ত্রিক শব্দ। কেবিনে অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা, তিন্নীর দিকে তাকালাম এতক্ষণে। ও বুঝতে পেরেছে বাবাকে ছাড়তেই হবে। বাবা বস্তুটা স্বপ্নেই সম্ভব।

আমার বুক চিরে বেরিয়ে এল ''বাবরের প্রার্থনা,'' বাবাই-তিন্নীকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠলাম,'আমায় ধ্বংস করে দাও প্রভু! আমার সন্ততি স্বপ্নেই থাক।'

ঝুমুর হাসতে হাসতে বলল,'হোল না, হোল না।'

'আমার ধ্বংসে ফোটে যেন হাজার রক্তের ফুল,
আমার ধ্বংসে হোক না ওরা মুক্তি আকুল!'

ইদানিং ওর এই একটা স্বভাব হয়েছে আমার কবিতা দিয়েই আমাকে কাত করা। 'একটা নাম, কত ঈর্ষার, আতংকের আর ভালোবাসার এটাও শেষ হয়ে যাবে!' ঝুমুরের অভিযোগ কার বিরুদ্ধে?

ওর কথার রেশ টেনেই ওকে একটু টিজ করলাম–'সাথে সাথে তোমার পেছনে টিক টিক করার একজন কমে যাবে!'

ও দমবার পাত্রী না কি। একজন নয়, এক এবং শেষ জন!

কেবিনের বাইরে পুলিশের ভিড় বাড়ছে। ভেতরে আমরা পাঁচজন, পাঁচজনের ভেতরেই বিচ্ছেদের এবং অনিশ্চয়তার জন্য অস্থিরতা বাড়ছে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছি যাতে অন্যের কাছে ধরা না পড়ে যাই, সদা-দুরন্ত বাবাই-তিন্নীও কেমন চুপচাপ।

ওরা এলে গোটা হাসপাতাল জানতে পারত। আজ ওরা বাক্-রুদ্ধ, দুষ্টুমি ভুলে গেছে। ওদের মনে কি হচ্ছে জানতে বড় ইছা করছিল।

ওদের সমস্ত হেনস্থার জন্য দায়ী কে? ওরা ও কি আমাকে দুষছে?

সবার আগে ভেঙে পড়লে তপন। ওকে বাগে আনতে এমন জোরে চেঁচালাম যে আমি নিজেই ধরা পড়ে গেলাম। এর মাঝেই সিস্টাররা এলেন তাঁদের মালপত্তর বুঝে নিতে। অদ্ভুত হৃদয়হীন যান্ত্রিক ব্যাপার। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। যন্ত্রমানবী হিশাবেই ওঁরা কর্তব্য পালন করে থাকেন। থ্যাঙ্কলেস জবের এটাই জব্-স্যাটিসফেকসন্।

ঝুমুর বলল,'কি ভাবছ?

হেসে বললাম, আই মিস য়্যু এ্যান্ড মাই পিপল ব্যাডলি। (তোমার অভাব আর আমার লোকজনের অভাব আমি সবচেয়ে বেশী অনুভব করি)

ও বলল,' দ্যাখো তো, আমরা ভাবছি আবার দেখা হবার কথা, বিচ্ছেদের কথা, জেলের বন্দীরা খবর পেয়ে ওদিকে আনন্দ করছে তাদের আজিজুলদা ফিরে আসছে?'

বুঝলাম ও নিজেতে ফিরে আসছে। এটাই ঝুমুর; ওকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করলাম না। কারণ সান্তনা নামক বস্তুটার অস্তিত্বই নেই। যার ব্যথা তাকেই বইতে হয়।

উফ্ আমার মাথাটা যদি না থাকত,আমিই বোধ হয় পৃথিবীর সব থেকে সুখী ব্যক্তি হতে পারতাম। সত্যিকারের মানুষের মাথা বইবার ক্ষমতা পৃথিবীর কি আছে?

সোহনলাল হুইল-চেয়ার নিয়ে হাজির । আগে পেছনে নানান পোশাকের এবং পদের বিশজন সশস্ত্র পুলিশ। কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখি সে এক কান্ডই বটে! আরও প্রায় জনা পঞ্চাশ পুলিশ গোটা করিডর দখল করে আছে, অন্যান্য রুগী এবং তাঁদের আত্মীয়রা ভিড় করেছেন, পাশে বাবাই- তিন্নী আর তাদের মা চলেছে।

এই রুগীরা আমাকে দেখেননি, আমার এদিকটা ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। তবুও তাদের সমস্যার কথা তারা গোপনে লিখে জানাতেন, আমার দীর্ঘায়ু কামনা করতেন। মৃত্যুপথ যাত্রী এক রুগীর ছোট চিরকুটটা ভুলি কি করে?

'আমার আয়ু নিয়ে আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন?'

হ্যাঁ, তারপর তিনি বাঁচেনি, কে এই বাবর?

কতই বা তার বয়স ছিল? নিজেদের অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে আজ যারা আমাকে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত তাঁর সহমমী। চোখের পাতাটা ভারী হয়ে এল, একটু হেসে হাত তুললাম, কর্ডনের পুলিশের মাথার ওপর দিয়ে ৫০-৬০ জোড়া হাত উঠল, সিস্টার এর চোখে জল।

কে যেন বলল, 'হাসিটা ঠিক আছে' ?

বউ এর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, 'এমনও হাসি আছে দেখে কান্না মনে হয় .....

না কি যেন সেই গানটা........

লিফট নীচে নামল, দু'ধারে প্রস্তুত প্রায় আধ ডজন গাড়ি। শুধু পুলিশের গাড়ি নয় প্রাইভেট গাড়িতেও শাদা পোশাকের পুলিশ। সন্ধ্যা লাগছে। একজন সাংবাদিক এগিয়ে এলেন, পুলিশ বুঝে ওঠার আগেই ওর সাথে হাত মেলালাম।

জুনিয়র ডাক্তার, ট্রেনি মেয়ে, আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভিড় কেটে আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট প্রিজন ভ্যানের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বাবাই– তিন্নী তার আগেই গাড়িতে উঠে বসল, ওদের তীব্র প্রতিবাদের শেষ অস্ত্র, ওদের ধারণা হয়ত ওরা উঠলে গাড়ি অচল হয়ে যাবে।

ঝুমুর নীচ থেকে ডাকল ওদের, তিন্নীর ভীষণ আপত্তি। আমি বাবার সাথে যাব। 'বাবাকে পাউদার মাখিয়ে দেব চুল আঁচলে দেব'...

আর শোনার ধৈর্য ছিল না, আর চাপ সহ্য করার শক্তি ছিল না। সার্জেন্টটাকে বললাম, 'এদের নামিয়ে দিন।'

দেখলাম তারও চোখের কোণটা ভিজে গেছে। শেষ বিদায়ে বাবাই আর ঝুমুর এক সাথে চিৎকার করে বলল, 'সাবধানে থেকো।'

হেসে উত্তর দিলাম, 'অসাবধানের সুযোগ কোথায়? সাবধানে থাকতে হবে তোমাদেরই। কারণ তোমরা অদৃশ্য শত্রু দিয়ে ঘেরা।'

একজন ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরা শেষ বারের মত ফ্ল্যাশ মারতেই বললাম, 'ফ্লাশ গানের সাথে শট গান রাখুন।'

গাড়ি স্টার্ট নিল। ইঞ্জিনের শব্দ।

''বাবাকে যেতে দিতে হবেই'' ''কেঁদো না মা'' ধাতব যন্ত্রের শব্দে এই কথাগুলোই কানে বাজতে লাগল, বাবাই–তিন্নীর মুখ, ঝুমুরের অসুস্থ পান্ডুর মুখ, রক্তহীন ফোলা শরীর, অসংখ্য মানুষের মুখ ঝাপসা হয়ে গেল। ভাগ্যিস গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার!

চোখের জল শুকোতে না শুকোতেই গাড়ি এসে দাঁড়াল লৌহকপাটের সামনে। ঝুমুর, বাবাই ওরা এখনো হয়ত স্টেশনেই আছে।

জেলের চারদিকে বিশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে পৃথিবীর গতি স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখানে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভয়াবহ গুমোট আবহাওয়া, চাপা কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙে এদের। আর বুকচেরা নিঃশ্বাসের সাথে ঘুমোতে যায় এরা। সমাজ–সংসার এদের ত্যাগ করেছে। এরা কিন্তু ভাবে তাদের কথা। স্নেহ ভালোবাসা এখানকার অধিবাসীরা পায়নি, কিন্তু দিতে চায়। এরা কিছু দিতে চায়, কিছু করতে চায়। কিন্তু এদের 'হাত' কে করে দেওয়া হয়েছে অকেজো, মস্তিষ্ককে অলস। এটা করা হয়েছে কখনো বা বড় বড় বুলির আড়ালে, কখনো বা ভয়দেখিয়ে।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মার্কসবাদীদের পরিচালিত এ জেল দেখলে লেনিন কোনো সময়ই বলতেন না, এটা বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়!

উৎপল দত্তকেও দশ বার হোঁচট খেয়ে বলতে হত, ''ফুচিকের স্মৃতিধন্য কারাগার।''

'যাদের সঙ্গে জেল খেটেছি, এখন তাদের হাতে জেল খাটছি'

জেল আমার জীবনের নতুন নয়। যাদের সঙ্গে জেল খেটেছি এখন তাদের হাতে জেল খাটছি। কিছুই কি পালটায় নি? পালটেছে বই কি? এই যেমন বাঁশের লাঠির জায়গায় বেতের ছড়ি! আগে অত্যাচারে মাথা ফাটত, হাত ভাঙত লোকে দেখতে পেত, এখন লাং পাংকচার, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়। আগে বন্দীরা খেতে পেত। চুরি তখনও ছিল, কিন্তু সেটা হত গোপনে, বড় জোর দুটো ডিম কিংবা হাফ কিলো তেল।

এখন চুরিটা আইন সিদ্ধ। সেপাই বাবুদের ইউনিয়নের কল্যাণে জেলের সুপার ঠুটো জগন্নাথ। ডাক্তার থরহরিকম্প। মন্ত্রীদের নামে ''জিন্দাবাদ'' দিয়ে সকাল নটায় তেনারা ব্যাগ হাতে জেলে ঢোকেন, জেলের ভেতর থেকে বিনি পয়সায় বাজার করে বেরন। ''তেনারা''মানে সকলে নন কিন্তু, খুবই সামান্য অংশ। চুরির বহর শুনলে বোফর্সের দালালরাও এদের গুরু বলে মেনে নেবেন।

যখন দমদম জেলে ছিলাম দেখেছি ''এক ইউনিয়নের'' একজন সভাপতি 'এঁড়ে' পুষে দৈনিক বিশ কিলো দুধ বিক্রি করত। অসুস্থ বন্দীদের জন্য ওই জেলে প্রায় ৬০০ লিটার দুধ আসত। দুধের গাড়ি এলেই ''সভাপতিজী'' কা ''পঁচাশ বোতল'' চলে যেত। সেই দুধে তাঁর চলত ঢালাও কারবার। সেই টাকাই জেসপের শ্রমিকদের মাসে ১০ টাকা হার সুদে চক্রবৃদ্ধিতে খাটান তিনি। 'এঁড়ে' টা ধরা পড়েছে। এখন কারবার চলছে বিনা গরুতে।

তাঁর আরও এক মহান কারবার আছে। খাটিয়া ভাড়া দেওয়া। 'জেসপ' এবং পার্শ্ববর্তী শ্রমিক অঞ্চলের যে সমস্ত শ্রমিকদের থাকার জায়গা নেই, তাদের দৈনিক দু'টাকায় ব্যারাকে থাকার ব্যবস্থা করা। কে কি বলবে? যারা বলবে তারাই তো ডাকাত! চোরের বিচারক ডাকাত!

তাই ইউনিয়ন নির্বাচনে যখন দু'পক্ষ আমার কাছে এলেন, দু'তরফই দাবী করলেন, তাঁরা ''দু'নম্বরী'' বন্ধ করে দেবেন। আমি তাঁদের বললাম, 'না এতে আমি নেই, যে পক্ষ পোস্টার দেবে সকলের চুরি করার সমান অধিকার আছে তাদের পক্ষে আমি।'

প্রত্যেকের চুরি করার অধিকার স্বীকার করলেই যদি নিজেরা মারামারি করে চুরি বন্ধ করে।

এরকম ঘটনাও মাঝে মাঝে যে ঘটে না তা নয়, ঘটে।

বামফন্ট এক অদ্ভুত রাজনীতি চালাচ্ছে। ইন্দিরা ওপর থেকে এমার্জেন্সি চালু করতে গিয়ে যে ধাক্কা খেয়েছিল বামফন্ট সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করছে যে জনগণের মধ্যে থেকেই দাবি উঠুক — এর চেয়ে এমার্জেন্সি ভাল। এমার্জেন্সির গণতন্ত্রীকরণ হচ্ছে।

ইন্দিরা মানুষকে সংগঠিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ঘৃণাই কুড়িয়েছে, এঁরা সংগঠনের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না করে অধিকার দিয়েছে, সংগঠিতভাবে লুট কর। ফলে কর্মচারীদের বেশির ভাগ অংশই দাবি তুলছে, ইউনিয়ন ভেঙে দাও। ইউনিয়ন বা সংগঠন হল দু'নম্বরীদের আখড়া। ইন্দিরা শত চেষ্টা করেও যেটা পারেনি, এরা কৃতকার্যতার সঙ্গে সেটা করছে।

'শত্রু-রূপে' ইন্দিরা ধন্য এঁরা।

অসুস্থ কয়েদীদের দুধ-চিনি-চা-ডিমে চলছে রমরমা সিপাহী-ক্যান্টিন। অথচ বন্দীরা যখন বলেন, 'আমাদের ডায়েট কেটে বন্যাত্রাণ তহবিলে পাঠানো হোক।' তখন আসে আইনের কথা। শিব-ঠাকুরের একুশে আইনের দেশে সবই সব্বনেশে ব্যাপার।

জেলে বসে তাই ভাবছি, কে চোর? কে অপরাধী? কে বেশি মানুষ? যারা নিজেদের খাবার কেটে বন্যাত্রাণে টাকা দিতে চান তাঁরা; না, যাঁরা সেগুলো ঘুরিয়ে সুদে টাকা খাটান, ব্যবসা করেন এবং যাঁরা তাদের মদত দেয়, তাঁরা? শেষ বিচারের বিচারকরা কি বলেন দেখি।

জেল বিবর্তনের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে জেলকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে—

প্রথম যুগে বলা হোত প্রতিশোধাগার,

তারপর হলো—প্রায়শ্চিত্তাগার

তারপর হলো—কারাগার

এখন আবার সংশোধনাগার।

পুরানো-পচা জামায় নতুন কাপড়ের তালি মারতে গিয়ে সব সুদ্ধ খসে পড়ছে।

যে নামেই ডাক না কেন, জেল আছে জেলখানাতেই।

এরকম অবস্থাতে আমার জেলে আসাটাই যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যারা 'ভয়ে' অথবা সততার জন্যই জেলখানার এই জেল চুরি বন্ধ করতে চান তারা উৎফুল্ল। 'এখন যদি ওরা একটু সমঝে চলে।' এঁরা সংখ্যায় বেশি।

যাঁরা সরাসরি যুক্ত তাঁদের ভাবখানা—'এই রে শালা, না মরে আবার জ্বালাতে এলো।' একটু এড়িয়ে চলায় ভালো। এই এড়াতে গিয়ে একজন ধরিয়ে দিলেন আর একজনের ওষুধের প্রেসক্রিপশন-প্রায় ৬০০ টাকার ওষুধ।

প্রত্যেকেরই দাবি 'এর একটা বিহিত করুন।'

ওদের বোঝালাম, 'ডাকাত ধরতে ব্যর্থ হয়ে শেষে চোরের পেছনে কাঠি দিতে হবে? ওর মধ্যে আমি নেই।'

'৩৮০ কোটি টাকা যেখানে তছরূপ হচ্ছে সেখানে ৩৮০ টাকা তো কোন ছার।'

এই ওষুধ ব্যাপারটা জেলখানায় একটা সমস্যা। জেল হাসপাতাল বন্দীদের জন্য, না স্টাফদের জন্য এ প্রশ্ন সমাধান না হলে অসুস্থ বন্দীরা মরতে থাকবেই, কোনো ডাক্তারই জেলে টিকতে পারবে না।

ওষুধের দোকানগুলোর কন্ট্রাক্ট থাকে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র জেল স্টফরাই সপরিবারে বিনা খরচে চিকিৎসা পাবার সুবিধা পেয়ে থাকেন। এবং এর কোনো উচ্চ সীমা বাঁধা নেই। জেল স্টাফরা এ সুযোগ গ্রহণ করেন ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। ওরা ডাক্তার বাবুকে নির্দেশ দিয়ে ওষুধ লেখান। সেই প্রেসক্রিপশন জেল-নির্দিষ্ট দোকানে জমা দিয়ে (শতকরা বিশ টাকা কমিশন ছাড়া) নগদ টাকা নিয়ে আসেন।

ডাক্তারের ঘাড়ের ওপর বাড়তি মাথা তো নেই যে তাঁরা স্টাফদের মর্জি-মাফিক ওষুধ লিখবেন না। এই যন্ত্রণায় কেউ আর জেল হাসপাতালে চাকরি নিতে চান না। মন্ত্রীর হুমকি, আর অপমানের ভয়ে তাঁদের অবিবাহিত, যুবক স্টাফের জন্যও একেবারে বিশটা ইপিকোট

লিখে দিতে হয়। ইপি ফোর্ট হচ্ছে গর্ভসঞ্চার সংক্রান্ত ট্যাবলেট। বাজারে নাকি ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে।

ভাবতে পারা যায় একই প্রেসক্রিপশনে ডুরাবলিন, ডেকাডুরাবলিন, কাইমোরাল ফোর্ট? কিংবা হেপাটাইটিসের জন্য কিলো কিলো গ্লুকোজের সাথে শ-শ 'কামপোজ'? কোনো ডাক্তারই হেপাটাইটিসে 'কামপোজ' দিতে চাইবেন না, ওটা 'ধর্মীয় নিষিদ্ধ'। কিন্তু এখানে না দিয়ে উপায় আছে? তাঁরা ডেভিডসন সাহেবকে মাথায় তুলে রেখে শুধু লিখে যান, তারা ডাক্তার নন, ইউনিয়নের দাদাদের অর্ডার ক্যারিয়ার কেরানি মাত্র। তাঁকে এক সিপাইবাবুর মায়ের জন্য (৬২ বৎসর বয়স্কা) ফাটাইল ট্যাবলেট লিখতেই হবে। কারণ তিনি 'দাদা'। কে ডাক্তারি করবে! মনক্ষুণ্ণ ডাক্তার বড়জোর হেসে বলতে পারেন, 'আপনার মায়ের কি এখনও সন্তান দরকার!'

এর ফলে জেলরের ভাষ্য অনুযায়ী গত মাসে (জুলাই ১৯৮৭) এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা ওষুধের বিল হয়েছে! তাই বন্দীরা ওষুধ পাবেন না। জেলরকে চ্যালেঞ্জ জানালাম— এর কতটা সিপাহীদের জন্য ব্যয় হয়েছে জানান। উনি বললেন, এক লক্ষ পনেরো হাজার। বাকি পনেরো হাজার টাকা এক হাজার বন্দীর জন্য খরচ। মানে দৈনিক ৫০ পয়সা। এর মধ্যে আবার আমার মত প্রিভিলেজড বন্দীও আছেন। তাহলে প্রায় সাড়ে নশ বন্দীর জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ ২৫–৩০ পয়সারও কম!

জেলর থতমত খেয়ে বললেন, কি করব বলুন, আমরা তো কতবার বলেছি, স্টাফদের পুলিশ হাসপাতালের সাথে যুক্ত করা হোক। তা কর্তারা শুনছেন কোথায়? কর্তারা শুনছেন না –সুতরাং বন্দীগুলোই মরুক! অদ্ভুত রাজনীতি, সিদ্ধার্থবাবু শিউরে উঠছেন, না মুচকি হাসছেন। তারাপদ লাহিড়ীর চিতাভস্ম দিয়ে চিকিৎসা চলুক বন্দীদের!

প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের কালে আমাদের মধ্যে একটা চুটকি চালু ছিল, বর্তমান মন্ত্রীদের মধ্যেই একজন এর স্রষ্টা। প্রফুল্লবাবু তখন ''আম দরবার'' করে প্রতিদিন সকালে সাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট শুনতেন। একদিন এক বৃদ্ধ এলেন, তাঁর ছিল বিশাল হাইড্রোসিল। তিনি এসে প্রফুল্লবাবুকে বললেন, 'স্যার একটা আর্জি ছিল'।

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'বলুন'।

বৃদ্ধ নিজের হাইড্রোসিলটা দেখালেন। প্রফুল্লবাবু, বিশালকার বস্তুটা দেখে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আমি কি করব? আমি তো ডাক্তার নই?'

বৃদ্ধ নাছোড়বান্দা, 'আপনি পারেন স্যার।'

অবাক প্রফুল্লবাবু বিরক্ত হলেন, 'যান, আপনি হাসপাতালে যান, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

বৃদ্ধ আমতা আমতা করে বললেন, 'না স্যার, তার দরকার হবে না, আপনি একটু হাত বুলায়ে দ্যান। আপনি যাতে হাত দ্যান সেটাই উবে যায়। আপনি যদি আমার এইটায় হাত বুলায়ে দ্যান এটাও উবে যাবে!'

সরকারীভাবে স্বীকৃতি চিরকুমার প্রফুল্ল বাবু কি করেছিলেন চুটকি কার সেটা বলেন নি। তিনি কিন্তু প্রফুল্ল সেনের ছেঁড়া জুতোয় পায়ে গলিয়ে যাতেই হাত দিচ্ছেন সেটাই উবে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্সি জেলের তেল শুধু পশ্চিম বাংলার জেলগুলোতেই নয়, হাসপাতালগুলোতেও সরবরাহ হত, বাইরেও বিক্রি হত। সেটা বন্ধ। নাকি ''ভীষণ'' ক্ষতিতে চলছিল ঘানি। ঐ জেলের ছাড়া, দমদমের কম্বল, কার্পেট, আলিপুরের প্রেস, মেদিনীপুরের সরষে এবং চাল, বহরমপুর জেলের গামছা এবং তাঁতবস্ত্র এগুলো সবই লাভদায়ক ছিল।

কার্যত জেলের বন্দীদের জন্য যে ব্যয় সেটা জেলের বন্দীরাই তুলে দিতেন। এখন আলিপুরের প্রেস একটা 'পবিত্র গাই'। টন টন কাগজ আসে ছাপা যত না হয়, চোরাই বাজারে বিক্রি হয় তার বেশি। ব্যাগকে ব্যাগ লেড টাইপ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দামি দামি মেশিন অকেজো। সবই উঠে যাচ্ছে।

এ চুরি হচ্ছে সংগঠিতভাবে। বন্দীরা কাজ করতে চান না এটা বাজে অজুহাত। কাজের ব্যাপারে বন্দীদের এরকম কোনো স্বাধীনতাই থাকার কথা নয়।

আসলে যে যেখানে আছে সেখান থেকেই 'কিছু পাইয়ে দাও বা করে নাও' সরকারের এই নীতিতেই এই হাল।

এই সব আমিও জানি ওরাও জানেন। তাই জেল গেটেই সুপার অভ্যর্থনা জানালেন মিষ্টি হেসে, 'দেখবেন, বুঝতেই পারছেন আমরা স্যান্ড উইচ্‌ড।'

বললাম, 'দেখুন আমাকে না গাইতে হয়।

তোমারইজেলে

পালিছোঠেলে

তুমিই ধন্য, ধন্য হে।'

কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম আমি আমার ফরমে ফিরে আসছি। উনি জেলের অবস্থা ব্রিফ করলেন। হাসতে হাসতে বললাম, আমি তো এটাই চাই। আমি চাই সর্বাত্মক ধ্বংস। ইউনিয়ন এই ধ্বংসের কাজ তরান্বিত করছে বই কি! আমার কাছে অনেস্ট অফিসার্স আর মোর ডেঞ্জারাস। কারণ তাঁরাই এই নরকের পাহারাদারি করেন। নরকরক্ষীর অনেস্টি মানে চরম নারকীয় ব্যাপার সেটা।

উনি বোধ হয় একটু ধাক্কা খেলেন। ঠিক এটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম ভিজিলেন্স কমিটির রিপোর্টে জেলের দুর্নীতি কিন্তু এখন ১৩ নম্বরে নেমে এসেছে। এমনকি বিচার ব্যবস্থারও নীচে। তাহলেই বুঝুন, দুর্নীতিমুক্ত সরকারী সংস্থা বা ব্যক্তি, আর মোশন ছাড়া ম্যাটার এর অস্তিত্ব, দু'টোই আমার কাছে অকল্পনীয়।

উনি হাসলেন। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমিও দু'জনের ঘাড়ে চেপে প্রধান দরজা দিয়ে জেলের ভেতরে ঢুকে গেলাম।

আইন প্রণয়নকারী এবং আইন প্রয়োগকর্তাদের মধ্যে যদি চীনের পাঁচিল থাকে প্রশাসনে অরাজকতা দেখা দেবেই। আর এই নৈরাজ্যের দায়–দায়িত্ব হতভাগ্য শাসিতদেরই বইতে হয়। যখন শাসিতরা হাত পা বাধা বধ্যভূমির পশু হয় তখন তো কথাই নেই।

কথাগুলো বলছিলাম নওজোয়ান জেলর মনোজ বাবুকে। ছেলেটা কিছু করতে চায়। ধান্দাবাজ নয়, ছাত্র জীবনের আদর্শ ফাদর্শগুলো এখনও ওর মধ্যে ঝিলিক মারে। কিন্তু সদিচ্ছা দিয়েই তো সব হয় না।

আইন যাঁরা তৈরি করছেন তাঁরা জানে না সমস্যা কি। তাঁদের লক্ষ্য তো আবার কি করে ভোটে জেতা যায়। ফলে তাদের থাকবে একটা পপুলিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী। বন্দীদের তো ভোট নেই সুতরাং বন্দীদের ভেট দিয়ে যদি ১০-২০টা মাস্তান রাজনৈতিক কর্মী পাওয়া যায় ক্ষতি কি। জেলর-সুপাররা তো সংখ্যায় কম। তা ছাড়া তারা তো আর মারামারি করে ভোট এবং ভেট দিতে পারবে না।

তাই জেলর-সুপারদের ওপর অলিখিত নির্দেশ, জেলে রাজনৈতিক কর্মী তৈরি কর। বিভাগীয় মন্ত্রীরাও তাই চায়, যারা কয়েক বছর আগেও 'মুক্তি-সূর্য জিন্দাবাদ' করেছে, তাঁদের জামার রঙ পাল্টে গেছে। বন্দীদের রুটিটা ডিমটা দুধটা ডান্ডা মেরে কেড়ে নিয়ে অমলেট টোস্ট চিবুতে চিবুতে অভুক্ত, অসুস্থ বন্দীকে কেউ বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা, কেউ বা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা শোনাচ্ছে। জেল-সুপার নির্বিকার দর্শক — 'হুজুরের দল বাড়ছে', তাঁদেরও ভবিষ্যৎ মজবুত হচ্ছে। হতভাগ্য বন্দী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

সাত বছর ডান্ডা বেড়ী পরে পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে

৭০ থেকে ৭৭। সাত বছরেরও বেশি সময় অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে জেল খেটেছি, ডান্ডা-বেড়ী পরে পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, ২৪ ঘন্টা লক আপে থেকেছি, তার ওপর ছিল প্রতিটি স্মৃতি বিজড়িত দিনে পাঁচ-হাতি-ডান্ডার বাড়ি।

১ মে (মে দিবস), পয়লা অক্টোবর (চীনা বিপ্লব দিবস), ৭ নভেম্বর (অক্টোবর বিপ্লব দিবস), ২২ এপ্রিল (লেনিন জন্ম দিবস), এ সমস্ত দিনগুলো এলেই জেল হাসপাতাল খালি করে দেওয়া হত। হাত পা ভাঙা, মাথা ফাটা 'নকশাল' বন্দীতে হাসপাতাল ভর্তি হয়ে যেত।

এত নির্যাতন সত্ত্বেও জেলকে কোনো সময় খাঁচা মনে হয়নি। কারণ দু'টো। আমরাও তো আর হাত তুলে মার খেতাম না, হাতের কাছে যা পেতাম তাই নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তাম। নিজেরা জেলে এসেছি বলে তো আর হাত আর মাথাটি স্টেট ব্যাংকে সুদে জমা দিয়ে আসি নি। আমাদের এই অদৃষ্টপূর্ব লড়াই শত্রুপক্ষেরও শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছিল। শত্রুপক্ষেও ছিল 'বীর পূজার দল'। তাঁরা ত্যাগের এবং দৃঢ়তার প্রতি সম্মান জানাতে জানত। কারণ তাঁরা ছিল যথার্থই যোদ্ধা।

একজন যোদ্ধা অন্য যোদ্ধাকে সাধারণত সম্মানই করে থাকে, লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুকে পরাজিত করতে হবে কিন্তু তাঁর বীরত্বের জন্য প্রাপ্য সম্মান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত হত না। তাঁরা চরিত্র হনন, ব্ল্যাক মেল, এগুলোকে ঘেন্না করত।

আমাদের ব্যাপারগুলো আমরা লড়াইয়ের ময়দানেই ফয়সালা করে নিতাম, এটাই ছিল সে যুগের এথিক্স। অনেকেই ভাবতে পারেন এ তো মধ্যযুগীয় শিভালরি। হ্যাঁ, এই শিভালরি ছিল বলেই সে যুগ অমন মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের জন্ম দিতে পেরেছিল। সেটা ছিল বলা যায় শাসক শ্রেণীর কাছে ব্রিটিশ এথিক্স মেনে চলার সময়।

এখন এসেছে আমেরিকান এথিক্স মেনে চলার সময়। হাতে মারার জায়গা নিয়েছে ভাতে মারা, লড়াইয়ের ময়দানে ফয়সালা করার জায়গা নিয়েছে ষড়যন্ত্র। যুক্তির লড়াইয়ের বদলে এসেছে কুৎসা, চরিত্র হনন, ব্ল্যাক মেইলিং। অদ্ভুত এক সন্দেহ বাতিক মানসিকতা। প্রত্যেকে, প্রত্যেককে সন্দেহ করছে এবং এটা ছড়ানো হচ্ছে ওপর থেকে। তার ফলে তারা

নিজেরাও সন্দেহের শিকার হয়ে পড়ছে। অসুস্থ আবহাওয়া, অসুস্থ পরিবেশ, দম বন্ধ হয়ে আসা বাতাবরণ।

মন্ত্রীরা সরাসরি ইউনিয়নের মাধ্যমে ফরমান জারি করছেন। ফলে জেলর–সুপার বন্দীদের কথা ভাববেন কখন? ইউনিয়নের আর্জি এবং দাবি শুনতেই তাঁদের সময় চলে যায়। 'দরবারে হেরে/ বউকে ধরে মারে'। জেলর–সুপার ইউনিয়নের সাথে না পেরে উঠে যত কড়াকড়ি করেন বন্দীদের ওপর। ফলে বন্দীরা দ্বৈত শাসনের বলি। ইউনিয়নের শাসন, জেলর–সুপারেরশাসন।

জেল সুপারকে ইউনিয়ন নেতা ঃ
''যাবে শালা ঘরে ঢোক''

বর্তমানের জেলর–সুপারদের দেখলে করুণা হয়। এক ইউনিয়নের এক নেতা সুপারকে সম্বোধন করলেন, 'যা বে শালা ঘরে ঢোক।' সুপার বেচারা কোন্ ইউনিয়নের কথা শুনবে? মুখ্যমন্ত্রীর ইউনিয়ন, না জেলমন্ত্রীর ইউনিয়ন। জেলমন্ত্রীর ইউনিয়ন এই জেলে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি। কিন্তু কোনো কাজ করতে পারে না। কারণ, স্বরাষ্ট্র সচিব, অর্থ সচিব সব আটকে দিচ্ছে।

টাকার বা জীবন মানের ভিত্তিতে নয়, এখানে তো শ্রেণী (!) বিশ্লেষণ করতে গেলে নির্যাতনের ভিত্তিতে করতে হবে দেখছি। আর্থিক উপার্জনেরই বা এক একজন জেল–সিপাহী নেতা একজন জেলর (সৎ বা ভীরু অথবা ভদ্র) থেকে কম কিসে! মাকর্সবাদের সমস্ত শিক্ষা পালটে যাবার জোগাড় হয়েছে দেখছি। দুই ইউনিয়ন যদি শুধু নিজেদের মধ্যেই লড়াইটা সীমাবদ্ধ রাখত তা হলেও বুঝতাম। তারা বন্দীদের নিয়েও টানা–হেঁচড়া শুরু করে দিয়েছে। এতে বন্দীদের মধ্যকার সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠেছে।

ইউনিয়নগুলো সোজাসুজি চলছে পুলিশের নির্দেশে। আই পি এস সংগঠন পরিষ্কারভাবে জেলকে সিভিল শাসন থেকে পুলিশি শাসনে আনতে চায়। এরই জন্য সব সময় তারা জেলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে সিভিলিয়ানদের অযোগ্যতা, অপদার্থতা প্রমাণ হয়। দুই ইউনিয়নের মধ্যেই কিছু পরিচিত হয় পুলিশি এজেন্ট আছে, তেমনিই আছে বন্দীদের মধ্যেও তাদের তল্পিবাহক।

জেলর–সুপার এই ত্রিমুখী চাপে হতভম্ব। সামান্যতম সিদ্ধান্ত নিতেও অপারগ। তাই কোনো জেলে সুপার (যেমন দমদমে) পুলিশের ১১২ টাকার মাইনের ইনফরমারের মত কাজ করেন। কলকাতার বাইরের একটি জেলের সুপার যেমন মহান দায়িত্ব নিয়েছেন বন্দীদের মধ্যে এবং সিপাহীদের মধ্যে সরকারের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করাবেনই। অথচ তিনি রাজনীতির কিছুই জানেন না, বোঝেন না। সুতরাং কিছু ধান্দাবাজকে দলে টানার জন্য প্রচুর সুযোগ দিয়ে দল ভারী করছেন। এতে ব্যাপক অংশ নিজেদের বঞ্চিত এবং নির্যাতিত মনে করছেন। তার দলে টানার পদ্ধতিও বিচিত্র — জেলের মধ্যে ড্রাগের কারবার করার অবাধ সুযোগ দান, মদের সরবরাহ এবং ইন্টারভিউ–এর সময় বাইরের দেহ পসারিণী ঢুকিয়ে নিজের অফিসে কিছু লোককে যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে নেবার সুযোগ দেওয়া।

বর্তমান আলিপুর জেলের সুপার আধা পাগল। অর্থাৎ তাকে পাগল করে দেওয়া হয়েছে। তার অপরাধ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিদের স্বীকৃতি দিতে চান। তাতে চলবে কি করে! তাঁদের সব কারবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব রাইটার্সের সরাসরি নির্দেশে বলীয়ান

বলীয়ান হয়ে তারা সুপারের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তাঁর বউ মেয়েও বেরতে পাচ্ছে না। বেচারা বন্দীদের কথা ভাববে কখন? ফলে পাগল হয়ে যেতে বসেছে। অসংলগ্ন কথা বার্তা, অদ্ভুত সব কাজ করে বসে।

'চারুদা, বলুন আমি কি ভূল করছি?'

সেই পুরনো পুরনো কথা, পুরনো শব্দ, হাসপাতাল, আমদানী এক। চাবি খোলার আওয়াজ ঘটাং শব্দে লোহার গেট বন্ধ! পৃথিবী পেছনে পড়ে রইল, ঘুরুক সে ঘুরুক। ঘুরুক তার সুতিকাগারকে বন্দনা করে, ঘুরুক! ঘুরতে ঘুরতেই সে রূপবতী হোক কিংবা বুড়িয়ে যাক!

পৃথিবীর এ গতি থেকে আপাতত বিচ্ছিন্ন হলাম আমি। আমর গতি স্তব্ধ। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ। চকলা ওঠা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে নির্দিষ্ট সেলের দিকে পা বাড়ালাম। গান্ধী–নেহরুর পাথরের মূর্তি ডান দিকে পড়ে রইল। বাঁ দিকে রামকৃষ্ণ মজুমদারদের শহীদ বেদী। একটু থেকে সেলাম জানালাম, 'শক্তি দাও, তোমরা শক্তি দাও, বিপ্লবী কিনা জানি না, আমার বিদ্রোহী সত্তাকে শক্তি দাও। প্রলোভন জয় করার শক্তি দাও! প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি দাও। তোমরা আমাকে ভুলো না। ভুল বুঝ না! সেলাম তোমাদের, লাখো কোটি সেলাম। কি করে গেছ তোমরা, সে বিচার করার অধিকার আমার নেই।'

এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটা 'সেলের' সামনে এসে গেলাম। জেলের মধ্যে জেল, তার নাম সেল। সেল মানে একটা ব্লক পাঁচিল দিয়ে অন্যান্য ব্লক বা বিল্ডিং থেকে পৃথক। জেলর, ডেপুটি, চিফ–হেডওয়ার্ডার, দু'জন সিপাহী আর দু'জন কায়েদী আগে–পিছে আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে এল। এ সেলটা দোতলা, পাঁচটা করে ঘর।

১ নং সেল! ঘরের সামনে অপ্রশস্ত বারান্দা জাল দিয়ে ঘেরা, মুক্ত বাতাস যাতে না ঢুকে পড়ে তার ব্যবস্থা আর কি!

৭২ সালে কমরেড চারু মজুমদারের গ্রেপ্তারের পর এই সেলের দু'তলায় দুটো ঘর পাঁচিল তুলে পৃথক করা হয়। বারান্দাটা ঘন জাল দিয়ে ঘিরে সিঁড়ির মুখে জাল দেওয়া দরজা বসানো হয় যাতে বাইরে থেকে কেউ না দেখতে পায়। নীচে দাঁড়িয়ে একবার উপরের দিকে তাকালাম। একটা লোকের মুখ নিমেষে উঁকি মারল। এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ যেন বুকের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে।—

'কি বউ বাচ্চার জন্য মন খারাপ করছে?' হ্যাঁ, এই তো সেই কণ্ঠস্বর, যিনি বলেছিলেন 'বিপ্লবীর যন্ত্র নয়, মানুষ, মানুষ বলেই তাঁরা হাসেন, মানুষের দুঃখে কাঁদেন। যে কাঁদতে জানে না সে বিপ্লবী নয়।'

মনে পড়ে গেল ৭০ সালের কথা, বাবা মারা গেছেন শুনেছি। আমি তখন গ্রেপ্তারি পরওয়ানা এড়িয়ে সুন্দরবনে কাজ করছি। বাড়ি যাবার কোনো সুযোগ নেই। পার্টিতে প্রত্যেকেই জানতেন আমি বাবারই ছেলে। দু'জন দু'জনের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিলাম। সেই বাবাকে দু'বছর দেখিনি, তাঁর মৃত্যুতে যেতে পারলাম না। মনটা খুবই খারাপ। চারুদা দরদভরা চোখ দুটো তুলে বললেন, 'কি ছাত্র নেতা (ওই নামেই ডাকতেন) মন খারাপ করছে? মায়ের সাথে একবার দেখা করে এস না।'

''বউ বাচ্চার জন্য মন খারাপ করছে?" হ্যাঁ এই তো সেই কণ্ঠস্বর! ভুল ভাঙল, বুঝতে পারলাম হ্যালুশিনেশনে ভুগছি। এই এ্যাটিনোলোল খেলে এ সম্ভাবনা আছে। জেলর বললেন, 'চলুক, ওপরেই আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে!'

আবার চমক! কি! ঐ ঘরে, যেখানে উনি এলেন না, সেই ঘরে আমি থাকব? অদ্ভুত এক অনুভূতি! কাঁধে চেপেই ওপরে উঠলাম। একেবারে নিখুঁত ব্যবস্থা! জেলে এটাই নিখুঁত। আবার একটা পাখা!

বন্ধ করে দিয়ে জেলর তার দলবল নিয়ে চলে গেলেন। একা হয়েই নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে গেলাম। সারা দিনের ধকল চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ল, ''চারুদা, বলুন আমি কি ভুল করছি?"

কিছুক্ষণ পরে হালকা হলাম। হেসে ফেললাম। একি! রোগ–শোক–দুঃখের ফাঁক দিয়ে একী চিন্তাধারা ঢুকছে?

প্রকৃতি–বিজ্ঞানীরা ভাববাদকে প্রকৃতি থেকে তাড়াতে অক্ষম হয়েছেন, মার্ক্স–এঙ্গেলস তাকে সমাজ এবং ইতিহাস থেকে তাড়িয়েছেন, তাই এখন ভাববাদের আশ্রয় মানুষের মস্তিষ্ক। এবার মাথার ভেতর থেকে তাকে তাড়াতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি অতই সহজ! এটা যে প্যাথোলজি হয়ে গেছে। কয়েক প্রজন্মের ব্যাপার!

ভূতের ভাষা আর কিছু আধুনিক কবিতা দুইই দুর্বোধ্য

অবিশ্বাসী মানুষ বলে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। মানুষ মাত্রই আছে একটা নির্ভরতার প্রশ্ন। নির্যাতিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ বোঝে তার নির্যাতনের কারণ কি। কিন্তু যখন যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে (অবশ্যই তার সীমাবদ্ধতা সহ) এখান থেকে মুক্তির উপায় পায় না তখনই সে তার সমস্ত বিশ্বাস অর্পণ করে বসে হয় 'ভগবানে' না হয় 'ভূতে' পড়ে আরও নির্যাতনের খপ্পরে। ফায়দা ওঠায় ধান্দাবাজরা। তাই জেলে ভূতের প্রকোপ বড় বেশি।

বাংলা সাহিত্যের কে যেন (খুব সম্ভব রাজশেখর বসু) ভূতের চার পুরুষের নাম ঠিকুজী তৈরি করেছিলেন। ভূতের বাপ অদ্ভুত, তার বাপ কিম্ভূত, তার বাপ যমদূত, যমদূত থেকে অদ্–ভূত, কিম্–ভূত, ভূত। জেলে তো ধুলো বালি থেকে পাহারাদার সকলেই সেই আদি পুরুষের চেলা বা দূত। বাইরে তো কত লোকের কত কেটে –ছড়ে যায়। কটা ঘা সেপ্টিক হয়? এখানে একটু কাটুক অমনি পেকে সেপ্টিক হয়ে ভুগিয়ে ছাড়বে!

জেলের একটা গোলাপ, বেলফুল কিংবা রজনীগন্ধা ছিঁড়ে নাকের কাছে আনলেও কোনো গন্ধ নেই। মনে হবে কাগজের ফুল। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। এরই জন্য জেলের ভূত আর ভূতেদের জেল একাকার হয়ে গেছে।

সন্ধের পরে রাত যত গভীর হয় খালি ভূতের গপ্প, সে ভূতও কত রকম। নক্‌শালভূত, সাহেবভূত, কয়েদীভূত, ব্যান্ডেজভূত, হনু ভূত, পেত্নি, এর কি আর শেষ আছে! সব মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে—জেলটা বেশির ভাগ সময় ভূতেরাই দখল করে থাকে। পাহারাদারীতে থাকে যমদূতের চেলারা!

তবে ভূতেদের দেখা পাওয়াটাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। ভাষা জানলেই ভূতেদের কথা বোঝা যায় না। ভূত সম্পর্কে যদি জ্ঞান থাকে তবেই ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে তাদের কথা বোঝা যাবে।

ব্যাপারটা কতকটা কিছু কিছু তথাকথিত প্রগতিশীল আধুনিক কবিতার মত। আপনি ভাষাটাও জানেন, শব্দগুলোর মানেও জানেন, শব্দগুলো জুড়ে যে অর্থ হয় তাও বুঝতে পারলেন, অথচ কবিতাটা বুঝলেন না, কবির কথা বুঝতে পারলেন না। গোটা ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য রয়ে গেল। এরই জন্য কিছু কিছু কবিকে কবিতার মুহূর্তটা ব্যাখ্যা করতে হয়। ভূতেদের তো আর সে সুযোগ নেই-তাই আগে থেকে 'জ্ঞান' নিয়েই তাদের কথা বুঝতে হয়। যিনি বুঝতে পারেন তিনি 'রিডল অফ দ্য মাইন্ড' কাটিয়ে ডিভাইন লাইট এর সন্ধান পান। যমদূতের চেলারাও যে আলোকে আলোকিত হয়ে তাঁর পথ পরিষ্কার করে দেন! যাতে করে চেরাপুঞ্জী থেকে পন্ডীচেরীতে তিনি ভূতের নেত্ত নাচতে পারেন।

বারীর ঘোষরা যাবজ্জীবন ভূত ঘেরাও হয়ে কোনো এক নজরুলকে লিখতে থাকুন —। 'তোমার ধূমকেতু যেন সকল মেকী দেশপ্রেমিকদের দাড়ি-গোঁফ জ্বালিয়ে দেয়!'

ভূতের জন্য দরকার জেলের সেল। যদি সে 'সেল'-এর ঘর অন্ধকার স্যাঁত স্যাঁতে, ৭ পা বাই ৭ পা হয়, তার এক কোণে যদি খাবার জলের কলসি আর মল মূত্রের ঢাকনা বিহীনটুকরি পাশাপাশি থাকে, পিপাসার জলে পেচ্ছাবের গন্ধ যদি মেশে, যদি আবার হয় 'সেলটা' পশ্চিমমুখো, এবং আপনি যদি হন আ-জীবন 'বিলেতে মানুষ হয়ে আসা, মহারাজার আশ্রয়পুষ্ট হয়ে যদি আপনার পুষ্টি হয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ যদি যুক্তিবদ্ধ মনের 'পাপ তাড়নায়' অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন, এবং তার ফলে যদি জেলে আসতে হয়, এসেই যদি ঐ রকম সেলে থাকতে হয়, আর জেলটা যদি হয় প্রেসিডেন্সি জেল, নির্ঘাৎ আপনার ঘাড়ে নরেন গোঁসাই এর ভূত চাপবে। আপনি 'ডিভাইন লাইটের' সন্ধান পাবেন। এটা পেলেই আপনার মুক্তি!

মেজাজে ভগবান সেজে আলো ছড়ান। পার্থিব সম্ভোগের সমস্ত রাস্তা তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে, আই সি এস হয়ে বা মহারাজের নায়েবি করে এর একশ ভাগের এক ভাগও আপনি পেতেন না।

কৃষ্ণ ঠাকুর কালিয়া নাগকে জিজ্ঞাসা করিলেন — 'তুমি যমুনার জলে বিষ ঢালিয়া তাহাকে বিষাক্ত করিয়াছ কেন? সেই জল পান করিয়া আমার কত রাখাল এবং গরু মারা গিয়াছে দেখো।'

কালিয়া নাগ কহিল-'ঠাকুর আমাকে তো অমৃত দাও নাই যে ঢালিব, বিষ দিয়াছ তাই বিষই ঢালিলাম।'

কোনো মানুষের হৃদয়কে অনবরত বিষে জর্জরিত করলে সে সমাজ সংসারকে বিষ ছাড়া আর কি দেবে?

কলকাতার সব থেকে বেশি 'নিরাপত্তার' বেড়া দিয়ে ঘেরা জেল প্রেসিডেন্সি জেল। আদিগঙ্গার পাড়ে প্রায় ১০০ একর জমিকে ১৮ ফুট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা জগৎ, '৭০-এর পর আরও চার ফুট বাড়িয়ে সেটা ২২ ফুট করা হয়েছে।

ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে যখন পড়তে আসতাম, অবাক হয়ে পাঁচিলটা দেখতাম, মাঝে মাঝে ভাবতাম কারা থাকে ওই কারান্তরালে? তখন কি জানতাম লাইব্রেরীর মাঠের উলটো দিকের ব্লকটাতেই আমাকে আসতে হবে আর কয়েক মাস পরে! ওটার নাম সাত-খাতা, 'খাতা' অর্থাৎ ব্লক।

৭৬–এ প্রেসিডেন্সি জেল ভেঙ্গে
৪৫ জন নকশালের পলায়ন

'৭৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্সি জেলের দরজা হট্ করে খুলে দিয়ে আমরা ৪৫ জন পালালাম। তারপর ধরা পড়লাম। সে সব এক পর্ব–থাক সে কথা। ধরা পড়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে না কি কোর্টে হাজির করতে হয়—কেতাবে লেখা আছে! যদি কেউ কোনো দিন এ লেখা পড়েন, তারা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন আমি ইনডিকেটিভ সেনটেন্স খুব কম ব্যবহার করি। কারণ তাহলে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা আছে। ইনডিকেটিভ সেনটেন্স–এর চরিত্রই হল হয় সত্য না হয় মিথ্যা। এই বাক্য যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করাও সহজ। আমাদের পুলিশ কর্তৃপক্ষও তাই ও ধার ধারেন না।

কে একজন না কি 'পুলিশি' কথার ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ব্যাখ্যা করেছেন সেফ গার্ডিং দ্য ডেমক্র্যাসি—বাংলাদেশের (পঃ বঙ্গ) লোকেরা অবশ্য বলে থাকেন 'পাজী'র প, 'লোচ্চার' ল, আর 'শয়তানের' শ নিয়ে 'উ' দিককার পানি 'ই' দিক করেই তৈরি হয়েছে 'পুলিশ'।

তাই ২৪ ঘন্টা কেন, ২৪ দিনেও লোকে জানতে পারল না আমি ধরা পড়েছি, কখনও ''রামমিশির যাদব'' কখনও ''ভোলা সিং'' কখনও বা ''আব্দুর রহিম'' হয়ে লালবাজারের রেজিস্টারে বিরাজ করতে লাগলাম। প্রায় দেড়মাস পুলিশ হাজত খাটার পর আমি হলাম—আজিজুল হক।

দেড়টা মাস এক পাল নররক্তলোভী নেকড়ের মধ্যে থাকা যে কি ব্যাপার সেটা এখন প্রায় প্রত্যেকেই জেনে গেছেন–বিভিন্ন কাগজের দৌলতে। সে সব গল্প তো প্রায় শ্রুতি হয়ে গেছে।

কিন্তু যেটা কেউ বলেন না তা হল এই একমাস, দেড়মাস একটা লোক এক পাল রক্ত লোলুপ নেকড়ের মাঝে থেকেও মানুষ হিসাবে বেরিয়ে আসে কি করে? তার শরীরের সর্বত্রই মানুষের অধিকার অর্জন–চিহ্ন। হাত পা ভাঙা, নখের কোলে কোলে রক্ত জমে পচা ক্ষত।

মাথার চাঁদিতে দগদগে ঘা, পুরুষ হলে যৌনাঙ্গের দুপাশে কালসিটে দাগ বৈদ্যুতিক–শকের চিহ্ন হিসাবে থেকে গেছে, নারী হলে স্তনের বোঁটায় ফোস্কা কিংবা ক্ষতবিক্ষত স্তন বোঁটা। হ্যাঁ, এগুলোই আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের চিহ্ন!

গণতন্ত্রের দেওয়া মনুষ্যত্বের প্রায় সব ক'টা চিহ্নে চিত্রিত হয়ে মানুষ আজিজুল হককে ব্যাংকশাল কোর্টে তোলা হল; ষ্ট্রেচারে শুয়ে চারজন পুলিশের ঘাড়ে চেপে কোর্টে উঠলাম, মনের গোপন কোণে ক্ষীণ আশা ছিল আমার এই রকম অবস্থা দেখে বিচারক নিশ্চয় আর পুলিশ হাজতের নির্দেশ দেবেন না।

আসামী বলতে আমি একা। আসামীর কাঠগড়ার জালের ফাঁক দিয়ে দেখলাম চেনা–শোনা অনেক মুখই কালো কোর্ট গায়ে বসে আছেন। গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে নিঃশব্দে বিচারক ঢুকলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম প্রত্যেকটা উকিল একসারে উঠে চিৎকার করছে– 'স্যার এঁকে জেল কাস্টডিতে পাঠান, হাসপাতালে পাঠান স্যার! স্যার এঁকে পি–সি দেবেন না স্যার!'

সেদিনকার সেই ম্যাজিস্ট্রেট আজকে হাইকোর্টের জজ! সেদিনই তিনি শপথ করে নিয়েছিলেন —'জজ' আমাকে হতেই হবে। তাই সব আবেদন নিবেদনকে তিনি দার্শনিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করলেন–'১৫ দিনের জন্য পুলিশ হাজত।'

ঘরসুদ্ধ উকিলবাবুরা আঁতকে উঠলেন–'স্যার মরে যাবে, স্যার।' ম্যাজিস্ট্রেট একটা বাঁকা চাহনিতে আমাকে দেখে কোর্ট মুলতুবি করে উঠে গেলেন।

নিজের ভাঙা হাত দিয়ে নিজেরই গালে একটা চড় কষালাম — 'আইন? মোহ? এরই জন্য তোমার কমরেডরা তোমাকে সংশোধনবাদী বলে বুঝলে? হল তো শিক্ষা?'

উকিলগুলোর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার আর কি করবে? এখন এক মেরে ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। আর মেরে যে ফেলতে পারবে না বোঝাই যাচ্ছে। এত মানুষ এখনও ভালেবাসে। কেন যে ছেলেগুলো যেচে গিয়ে চড় খেল।

হ্যাঁ ওদের ভালোবাসার মূল্য দিতে আমার ডান হাতের সব কটা আঙুল থেঁতলে গেল (কারণ গোটা শরীরের মধ্যে ওই আঙুলকটাই অক্ষত ছিল)

''কেন সমস্ত উকিল একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে জেল কাস্টডির জন্য প্রে করল? তাহলে নিশ্চয়ই ওখানে সংগঠন আছে? সংগঠন যখন আছে তখন বল নাম! মামদোবাজী আর কি! বাকি আছে তো দশটা আঙুল। আঙুল–কেলী শুরু হল। এক একটা আঙুলকে উলটে কব্জির সঙ্গে ঠেকানো আবার তালুর শেষ প্রান্তে নিয়ে আসা। পরিশ্রম ওদেরও কম হচ্ছিল না। থাক সে সব কথা। এ সব তো জানা জিনিস! 'আইনের' চোখে ধরা পড়ে আইনের দৌলতে আইনী পি সি খাটা শুরু হল।

রাখা হল লালবাজারের দু'তলার লক্–আপে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে মহিলা লক্ আপ তার উলটো দিকের একটা খালি ঘরে আমি একা। লক–আপের বাইরে একজন সার্জেন্টের ডিউটি। যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ বিষ। বিড়ির নেশা চেপেছে। লক–আপে বিড়ি পাই কোথায়?

এর আগে তো চোর পকেটমারগুলো ছিল। বিচিত্র কায়দায় তারা যে বিড়ি–সিগারেট স্মাগল করত তাতে চলে যেত। সে সব অদ্ভুত কৌশল, পরে অবশ্য কোন জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্য আমরাও সে সব কায়দা ব্যবহার করেছি।

অনবরত তল্লাসির হাত থেকে কোনো লেখা বা নিষিদ্ধ বই লুকিয়ে রাখতে হলে 'চোরের' এমন বুদ্ধি কাজে লাগে যা কোনো ভদ্রসন্তান ভাবতেও পারেন না। এগুলো ট্রেড সিক্রেট তাই বলা উচিত নয়। বললে সমস্ত চোর আমাকে বয়কট করবেন। আর আমি তো বসেছি ভদ্রসন্তানদের চুরি কথা বলতে যে কথা শুনলে চোরেরাও লজ্জা পাবে, চোরদের চুরির একটা এথিক্স আছে।

জাত চোর কোনো দিন কাউকে সহায়সম্বলহীন করে না। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে কয়েক দিন চলার মত মালপত্তর গেরস্থর বাড়িতে রেখে আসে। জাত–ডাকাত মেয়ে বা শিশুর গায়ে হাত দেয় না। জাত চোর, জাত ডাকাত কোনো দিন কারুর মুখের খাবার কেড়ে নেয় না। এগুলো যারা করে তারা চোরেদের বা ডাকাতদের জগতে সিডিউলড কাস্ট অর্থাৎ ছ্যাঁচড়া।

চোর বা ডাকাতদের জগতে সব চেয়ে ঘৃণ্য হল রেপিস্ট এবং পরস্ত্রী-গমনকারীরা। কোনো রেপিস্ট বা পরস্ত্রী-গমনকারীকে পেলে এরা 'পোঁচাড়া' মেরে আর 'পলিতা' দিয়ে তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলে। 'পোচাড়া মারা' হল একটা ন্যাকরায় মল-মূত্র মাখিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারা। 'পলিতা' হচ্ছে যখন কেউ শুয়ে থাকবে তার পায়ের আঙুলের ফাঁকে দেশলাই কাঠির পোড়া বারুদ থুতু দিয়ে বসিয়ে ধূপকাঠি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া-এতে আগুনের শিখা থাকবে না, কিন্তু ধূপের মত সেটা জ্বলতে জ্বলতে পায়ের পাতা পুড়িয়ে ছাড়বে, ঘুমের ঘোরে আগুনের ছেঁকা খেয়ে লাফিয়ে উঠলেই ফোস্কা যাবে ফেটে,জ্বালা যন্ত্রণায় সে রাত্তির তার ঘুমের গয়া। আর জেলখানায় লক-আপে ঘুম না হওয়ার মত অভিশাপ আর দুটো নেই।

যুগের সাথে সাথে মন্ত্রীত্ব বদলের ঢেউ এসে পড়েছে জেলেও। এখন জেলে দেখছি রেপিস্টরা সম্মানীয় কয়েদী। আগে এদের মাথার এ পাশ কামিয়ে এক পাশে লাল-টুপি পরিয়ে দেওয়া হত। তাই ওদের নাম ছিল লাল-টুপি কেস। সমাজের গার্জেনদের রুচি এবং মূল্যবোধের প্রতিফলনে জেলেও রুচি এবং মূল্যবাধে পালটেছে। 'লাল-টুপি'রা এখন কেউ 'চিফ রাইটার' কেউ 'আর্দালী'।

বিড়ির কথা বলতে গিয়ে চোরেদের ইতিবৃত্ত শুরু করেছিলাম। আবার বিড়িতেই ফিরে আসি, তবে ট্রেড সিক্রেটটা সিক্রেটই থাক। 'নিশিকুটুম্বে'র নিশিকুটুম্ব গল্পেই সম্ভব। ''উথলি যখন উঠেছে বাসনা"..... তখন কি আর করা যায়। সাজেন্টটাকেই বললাম ''একটা বিড়ি দেন তো!'' বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে থতমত খেয়ে বলল-''আমি তো বিড়ি খাই না স্যার! তা ছাড়া আপনার কাছে ডিউটিতে তো বিড়ি দেশলাই আনা যাবে না। সব নীচে সার্চ করে জমা রেখে দেয়।''

অবাক হয়ে গেলাম। কি ভাবছিলাম মনে নেই। হঠাৎ তীক্ষ্ণ মহিলা কণ্ঠের খিস্তি। ''এই মা-মেগো এই যে সিগারেট প্যাকেট আর দেশলাইটা, ছেলেটাকে দে। মা-মেগোরা মেরে ফেলেছে গা ছেলেটাকে! পাড়ায় যাবে না, এবার গেলে মুখে (স্ত্রী অঙ্গের নাম) ঘষে দোব!'' বুঝতেই পারলাম সামনের লক-আপ থেকে খিস্তিটা ভেসে আসছে। ওটা দেহ-পসারিণীদের লক-আপ। সার্জেন্টটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে খিস্তি দেনেওয়ালীর কাছ থেকে সিগারেট এনে একটা আমাকে ধরিয়ে দিল। মহিলা আবার খিস্তি করে উঠল-'এই, প্যাকেটটা ঝেড়ে দিলি যে শালা?'

এবার পুলিশ পুঙ্গবও ঝাঁঝিয়ে উঠল —''চুপ কর মাগী না হলে লক-আপ খুলে........ তে লাঠি ঢুকিয়ে দোব!'' এর পর দু'তরফে যে বাক্য বিনিময় চলতে থাকল সে সব আর লেখা যায় না। সেও এক অভিজ্ঞতা, দেহপসারিণী বনাম পুলিশ। এ বলে আমাকে দ্যাখ। ও বলে আমাকে দ্যাখ। সার্জেন্টটা হঠাৎ তেড়ে গেল লক-আপের দিকে। তারপর কি চুক্তি হল জানি না।

মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম-''দে না বাবা একটু মালিশ করে। আহা ছেলেটাকে কি মার মেরেছে!'' সার্জেন্টকে দেখি এক বোতল মদ নিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। তারপর বলল, ''আপনার পা দুটো লক-আপের বাইরে একটু চেষ্টা করে বার করে দেন তো! মাগীর আর দয়া ধরে না!''

আমি চিত হয়ে শুয়ে পা দ'ুটো দুই গরাদের ফাঁক দিয়ে বার করে দিলাম। ভদ্রলোক হাঁটু পর্যন্ত পেশাদারী কায়দায় মদ দিয়ে মালিশ করে দিল। একেবারে ম্যাজিক রিলিফ, ঘুম এসে

গেল। কিন্তু ঘুমানো তো চলবে না। রাত্রি একটার আগে ঘুমানো যায় না। কারণ তারপরই শুরু হয় জেরা অর্থাৎ ধোলাই। তাই গল্প করতে শুরু করলাম পুলিশ সার্জেন্টটার সাথে। বললাম ''লক–আপে মদ''?

সার্জেন্টও বস্তুবাদীর নির্ভীকতার সাথে উত্তর দিল —''ও মাগীদের কে আটকাবে। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে? পাড়ায় যেতে হবে না। সব বাবুকেই যেতে হয়। এমন ঘরে ঢুকিয়ে দেবে যে সারাজীবন ঘায়ে বরবাদ। আর তা ছাড়া দেখলেন তো মুখ?''

হেসে ফেললাম–''তা আপনারটাও তো দেখলাম!

বেচারা এবার সত্যিই লজ্জা পেল–''তা কি করব বলুন, এইসব চোর আর বেশ্যাদের নিয়ে কাজ করতে করতে সব......'' হই হই করতে করতে একপাল মেয়ে নিয়ে লক–আপ বাবু এসে হাজির। বুঝলাম এার সব উলটো দিকের ঘরের বাসিন্দা হবে। আদি রসে সিক্ত রসিকতা করতে করতে লক–আপবাবু কারুর গালে টোকা মেরে, কারুর পাছায় একটা চিমটি কেটে, কারুর বা থুতনীটি একটু নেড়ে দিতে দিতে গুনে গুনে ঢোকাচ্ছেন। মোট ৪১।

ঘটাং শব্দে লক–আপ বন্ধ হল। তালা টেনে পরীক্ষা করে বাবু একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। 'দেখিস শান্তিতে থাকিস সব। যদি গন্ডগোল করিস এমন না, ...ফাটিয়ে রক্ত বার করে দোব।'

ভেতর থেকে কে একজন মুখরা মেয়ে জবাব দিলো —''তে লোহার ক্যাপ পরে আসিস!'' বাবু চলে গেলেন।

আমার পাহারাদার সার্জেন্ট এতক্ষণ অ্যাটেনশনে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে গেটের উলটোদিকে মাথা রেখে গেটের গরাদের ওপর পা তুলে আমি চিত হয়ে শুয়ে আছি। মনে মনে ভাবছি আনন্দ জিনিশটা পেতে জানতে হয়। সার্জেন্ট ডাক দিল–'এই যে দাদা শুলেন না কি। আরে এদিকে আসুন না, খান একটা সিগারেট খান'। শুয়ে শুয়েই কোনোক্রমে শরীরটা ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে আবার কঁকিয়ে উঠলাম। সার্জেন্ট একটা সিগারেট ধরিয়ে দিল। মাঝবয়সী ভদ্রলোক। উলটোদিকের মেয়েরা তখনও কল কল করে আবোলতাবোল বকে চলেছে।

পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। আশ্চর্য! সবাই যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েগুলোও চুপ। সার্জেন্টটা গেটের পাশে রাখা টুলের ওপর বসে জোরে গরাদের একটা শিক আঁকড়ে ধরে 'রাম রাম সীতা রাম' জপছে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। এর আগে তিন তলায় ছিলাম–এসব তো দেখিনি। সার্জেন্টটা ফিস ফিস করে বলল এই শুরু হল। তিনার উৎপাত।

দূর থেকে একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। কাউকে হয়ত মেরে লক–আপে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তার কাতরানি! ঘটাং করে লক–আপ বন্ধের শব্দ! সার্জেন্টটা আর্ত চিৎকার করে উঠল–''দাদা, আপনি উনাকে বলুন না, উনি তো আপনাদের নেতা ছিলেন। আমি তো পাহারাদার!'' ফস করে একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ। ''ঐ দেখুন, উনি পাইপ ধরালেন।''

আর সহ্য হল না। ন্যাকামিরও একটা শেষ আছে। ধমক দিয়ে উঠলাম–'চুপ করুন তো। বলুন তো কি ব্যাপার?' কে শোনে কার কথা। সে তখন সমানে তারস্বরে ''রাম নাম'' করছে আর ''আমি না বাবা, আমি'' বলে চিৎকার করছে।

দমবন্ধ করা অবস্থা। ব্যাপারটা হালকা করার জন্য হাঁক দিলাম ''ও মাসীরা ঘুমুলেন নাকি''। কে জবাব দেবে? মনে হল সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের কোনো আওয়াজও আসছে না, শুধু একটানা যন্ত্রণা কাতর গোঙানির স্বর ভেসে আসছে। এমন সময় দূর থেকে একটা লক-আপ খোলার শব্দ ভেসে এল। আবার বন্ধ-এর শব্দ। পাশের লক-আপে বা ওপরে কেউ এল। কয়েক জোড়া বুটের মস্ মস্ আওয়াজ, একটা গোঙানি ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতেথেমেগেল।

ঘুমন্ত দৈত্যপুরী যেন জেগে উঠল, মেয়েগুলো কল কল করে এক সাথে জিজ্ঞাসা করল— 'বাবু কিছু বলছিলেন।

''ওমা তা হলে আপনারা ঘুমুননি, তো সাড়া দিলেন না কেন?''

''এ তলায় প্রতি মঙ্গলবার তিনি আসেন তো আজ চার বছর ধরে আসছেন। এই সময় তার পুজো করতে হয়। তিনি নাকি বাবু আমাদের ইজ্জতের কথা বলতেন, তা এই মহা-মেগোরো তিনাকে মেরে ফেলল গো। তিনি কত বড় মানুষ ছিলেন জানেন বাবু আপনি?''

সার্জন্টটা এতক্ষণে স্ব-মূর্তি ধারণ করল-'এই মাগী একটু জল দে তো! নখ ডোবাবি না, দেখিস কাপড়ে না ঠেকে!' জল খেয়েই ধমকে উঠল 'যা গিয়ে ঘুমো।'

তারপর আমাকে বলল-'আজ আপনি ছিলেন বলে বেঁচে গেলুম। আমার কি দোষ বলুন, আমি তো পাহারাদার ছিলাম ঃ শুধু ষ্টেচারটা বয়ে নিয়ে গিয়েছি।'

আমি তখন অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি এই লোকটার হাত থেকে কি করে মুক্তি পেতে পারি। এ বিরক্তিকর ববককানি থামাবে না। সত্যি যদি চারু মজুমদারের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে থাকে তা হলে এদের মধ্যে এই পাপ বোধ কেন? কেন এই অপরাধ বোধ?

এমন সময় লক-আপ বাবু এসে হাজির-''আজিজুল হক অফিস-কল।''

এই একটা কথা শুনলে লক-আপের আসামীরা আঁতকে ওঠে।

''অফিস কল'' মানে তাদের কাছে সাক্ষাৎ শমন। ডি-ডি অফিসে যেতে হবে। লোকে যেটাকে টর্চার চেম্বার বলে, প্রশ্ন-গালাগালি আর নির্যাতন।

সার্জেন্টটা বোধ হয় আমার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল। ওর মুখটা শুকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল-'স্যার, এই অবস্থায় ওকে নিয়ে যাবেন।'

লক-আপ বাবু একটু ম্লান হেসে বললেন-'এ তো তোমার-আমার কেস নয়, স্বয়ং সিপি-র কেস!'

উলটোদিকের লক-আপ থেকে মেয়েগুলো খিস্তি করে উঠল।

ষ্টেচার নিয়ে দু'জন হাজির। রাত দুটো। ষ্টেচারে শুয়ে লক-আপ বিল্ডিং থেকে চললাম অফিস বিল্ডিং-এ। আশ্চর্য কোনো বিকার নেই। আসলে বিপদটা আপদটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই ভয়, সেটা যখন শিয়রে শমন হিসাবে হাজির হয়ে যায়, তখন আর ভয় থাকে না। এখন আর মারার কোনো জায়গাও নেই।

এক হয় মেরে ফেলা। সেটা পারবে না কারণ লোকে জেনে গেছে। কোর্টে তুলতো না তাহলে। আমার মাকে আরও কয়েকশ বার তার অনুপস্থিতিতেই ধর্ষিতা হতে হবে-আমাকে বসে বসে এই সমস্ত জানোয়ারগুলোর পাশবিক অঙ্গভঙ্গি দেখতে হবে- অসহ্য! না প্রথম

প্রথম অসহ্য লাগত। এখন আর লাগে না। এরা সব মানসিক ভাবে বিকৃত। কোনো সুস্থ মানুষই এই ধরনের ব্যবহার করতে পারে না।

আকাশের অরুন্ধতী তারা
চিরকালই রহস্যময়

লক-অপ থেকে লনটা পার হয়ে উলটোদিকের বাড়িটাই অফিস, দু'তলায় ডি-ডি অফিস। চারতলা বিল্ডিং। উপরে থাকে কয়েকজন অফিসার। খুন-খারাবী রং-এর বিল্ডিং। রংটা সত্যিই সার্থক! এর রংটা বোধ হয় মানুষের রক্তেই করা হয়েছে! প্রতিটি ইটই অত্যাচারের সাক্ষী। ফ্লাড-লাইটে আলোকিত লনটা দেখে বোঝা গেল না আকাশে চাঁদ আছে কিনা।

অভ্যাসবসেই আকাশের দিকে তাকালাম। কাল-পুরুষটা তীর বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি খুঁজছি-সপ্তর্ষি মন্ডল, ষ্ট্রেচার যারা বইছিল ওদের বললাম দাদা উত্তর দিকটা কোনটা? ওরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, একটু সামাল দিতে দিতেই দেখতে পেলাম সপ্তর্ষি মন্ডল। বিশাল জিজ্ঞাসার চিহ্ন! ঐ তো বশিষ্ঠ! ওর গা ঘেঁষে অরুন্ধতী কেমন সুন্দর গায়ে ছুঁয়ে আছে। সাত ঋষির দরবারে অরুন্ধতী ঢুকে পড়ল কি করে? আশ্চর্য একরোখা মহিলা তো! এই অরুন্ধতী তারাটা চিরকাল আমার কাছে একটা রহস্য। রোমান্টিক রহস্য। কারণটা আমাদের গ্রামের হিন্দুদের একটা লোকচার। নতুন বউ শশুরবাড়ি এলে তাকে অরুন্ধবতী দেখানো হয়। প্রথমে সপ্তর্ষি মন্ডল, তারপর উজ্জ্বল বশিষ্ঠতে বউ-এর দৃষ্টি নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর তাকে বলা হয় — ঐ পাশে মিটিমিট করছে যেটা ওটাই অরুন্ধতী। ''দ্যাখো বউ, দ্যাখো!''

স্থূল বস্তু থেকে সূক্ষ্ম বস্তুতে দৃষ্টি নিয়ে যাবার এই প্রক্রিয়াটি বেশ মজার! পরে কত দিন এই উদাহরণটা ব্যবহার করেছি। আমাদের মধ্যে যারা মানুষের পেটের সমস্যাটা বুঝতেই চাইতেন না অথচ বড় বড় কথা বলতেন তাদের বোঝানোর জন্য বলতাম-বশিষ্ঠের ঔজ্জ্বল্যই অরুন্ধতীকে খুঁজে দেয়। এই গাঁয়ের এই এক বিঘে জমি দখলদারীই কৃষকদের দেখিয়ে দেবে দিল্লি-কলকাতা! সুতরাং জমিতে দৃষ্টিটা নিয়ে যাও। তারপর ওদের দৃষ্টিকে একটু একটু করে প্রসারিত করতে থাক, দেখবে ওরা ঠিক দিল্লির সিংহাসনটা দেখতে পেয়েছেন। হ্যাঁ, অবশ্যই দৃষ্টিটাকে সরাতে হবে। না হলেই চোরাবালিতে পড়ে যাবে।

অত্রু কে দেখলাম উত্তর আকাশে। বেচারা নিঃসঙ্গ। ওখান থেকে লাইনটা বাড়িয়ে দিতেই ম্যাড়-ম্যাড়ে ''ধ্রুবতারা'', স্থির-অনড়। নিজের অবস্থান পালটাতে রাজী নন। ''যার যেদিক খুশি ঘোরো আমি আমার অবস্থান পালটাতে রাজী নই।''

ধ্রুবতারা দেখতে দেখতেই ঢুকলাম অফিস বিল্ডিং এর গেটে। কলাপসিবেল গেটে দু'জন সি আর পি পাহারা দিচ্ছে। ওরা সরে দাঁড়াল। একজন বাঙালি সশস্ত্র জওয়ান সিগারেট খাচ্ছিল। হঠাৎ ছুটে এসে জলন্ত সিগারেটটা আমার গালে চেপে ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসতে থাকল।

ষ্ট্রেচারবাহকরা ধমক দিল-'এই শ্লা, তোর কি করেছে, যাদের আসামী তারাই সামলাক। এর জন্য তো শ্লা রা মরে! রাত দুটো। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকে সারি সারি ঘর। কোনোটার দোরের ওপর লেখা-মার্ডার সেকসন, কোনোটার গায়ে, বার্গলারি, রবারি।

আমার গন্তব্য আমি জানি, মাঝামাঝি হলঘরের মত ঘরটা–যার গায়ে লেখা এ্যান্টি–নকশাল সেকশন– আর গুহনিয়োগী হলের লাগোয়া ঘরটা ইন্সপেক্টারের। হলের ভেতরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ষ্ট্রেচার বাহকরা চলে গেল।

কয়েকজন বসে জুয়া খেলছে। বিভিন্ন সময় এদের সাথে পরিচিত হবার ''সৌভাগ্য'' হয়েছে। সুতরাং চিনতে অসুবিধা হল না। আমি শুয়ে আছি–ওদিকে মদ আর জুয়ার হুল্লোড়; অদ্ভুত ব্যাপার! জুয়া নিরোধ করার দায়িত্বে আছে এরাই। কতক্ষণ এরকম চলত জানি না।

হঠাৎ সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। ''সাহেব আসছেন।'' সাহেব ঢুকলেন। বাইরে কোথাও ঘুম ভাঙানিয়া পাখি চিৎকার করে উঠছে। অনবরত ভারী গাড়ির আওয়াজ। আজকাল আওয়াজ শুনেই বলে দিতে পারি– কোনটা পুলিশ ভ্যানের শব্দ! সাহেব এলেন, পেছনে বড় বাবু অর্থাৎ ইন্সপেকটর ইন চার্জ। হলের লাগোয়া ছোট ঘরটার পর্দা সরিয়ে ঢোকার মুখে আমাকে দেখে একটু বক্রহাসি হেসে বললেন–'খেল খতম!' স্যালুটের শব্দসহ তিনি —নিঃশব্দে কুরসী আসীন হয়েই হুঙ্কার ছাড়লেন —'লে–আও'। পীলে চমকানো হাঁক।

দু'জন জুয়াড়ি পুলিশের কাঁধে চেপে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। উনি উলটোদিকের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন – 'বসুন!' দু'জনের মাঝখানে একটা টেবিল। ওপারে উনি আর এ পারে আমি। বাকিরা স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে গেল।

'রুণুবাবু দেখো তো চা পাও কিনা!'

'ইয়েস স্যার!' বলে রুণুবাবুও হাঁক ছাড়লেন মনে হল!

ভাবছি এ কেমন হবে।

'তা হক সাহেব, আমাকে চেনেন!' প্রশ্ন করলেন। মাথা নাড়লাম। 'ন্না' মনে মনে গালাগালি যে দিলাম না তা নয়, বললাম—'কে হে তুমি হরিদাস যে তোমাকে চিনতে হবে!' একটু আশ্চর্য হলেন বটে তবে পরিচয়টা দিলেন না।

আমিও আশ্চর্য হয়ে ওর চোখটা দেখছিলাম। মাছের চোখ। মনে হয় চোখের পাতা নেই.। অদ্ভুত ঠান্ডা। কোনো জীবন্ত মানুষের এমন চোখ আমি দেখিনি। হ্যাঁ, এই লোকই পারে।

কোলরিজের কবিতা থেকে তুলে আনা 'ডেমন'। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল 'একী চোখ রে বাবা!' বোধ হয় একটু সোচ্চার চিন্তাই হয়ে গিয়েছিল! উনি একটু হাসলেন!

প্রঃ—''লেখাপড়া কতদূর?''

উঃ—শূন্য, কিছুই শিখিনি। এটুকুই শিখেছি।

প্রশ্নকর্তার স্বগতোক্তি—'হার্ড–নাট।' চালাক ঃ একে মেরে কিছু হবে না!

তারপর হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলেন ঃ–

'জেল ভেঙে কি হবে?'

''দেখুন এটা একটা অবজেকটিভ ল, ইনডিপেনডেন্ট অফ ম্যান উইল! যতদিন জেল থাকবে জেল ভাঙাও থাকবে! কারুরই ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করে না!''

—''জেল ভাঙার বিরোধিতা করে আপনি একট বিবৃতি দেন না!'

—'সে কি মশায়। আমি যদি সূর্যের বিরোধিতা করি–সূর্য উঠবে না নাকি? একটু দাঁত কিড়–মিড়ানি। বুঝতে পারলাম না। এর পরের অধ্যায়টা কি। পায়ের যা অবস্থা ঝোলানো যাবে না। না, দেখলাম উনি সামলে নিয়েছেন।

—''না, তা বলছি না, বলছিলাম এই সেন্সলেস ভায়োলেন্সের বিরোধিতা করুন।''

–''তা সেন্সিবল ভায়োলেন্স কোনটা?''

আমার উত্তর শুনে হোঁচট খেলেন।

আমিও স্ট্রাটেজি ঠিক করে নিয়েছি–ওকে প্রোভোক করে যাব– যাতে হাত তুলতে বাধ্য হয়। আর খেপে গেলে প্রশ্নটা ওলটপালট হয়ে যাবে। না, ইনিও খুব চতুর! আবার বাউন্সারটা ডাক করে বেরিয়ে যেতে দিলেন।

হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়লেন– ''আপনাকে বলতে হবেই কোন কোন জেল অফিসার আপনাদের সাহায্য করেছিল!''

''কিছু মনে করবেন না, আপনাদের অবস্থা কি রকম জানেন, আমি একটা তামিল কবিতার অনুবাদ করেছিলাম ঠিক সেই রকম–

''বাড়িকে রক্ষার জন্য
বানালাম একটা বাগান,
বাগানকে বাঁচাতে–
বেড়া,
বেড়ার জন্য রাখলাম দরওয়ান,
এখন দরওয়ানকে নিয়েই হয়েছে
যত চিন্তা!''

ব্যাস্ এবারে আমার হতভম্ব হবার পালা।

তামিল ! ''তার মানে আপনি অন্ধ্রে গিয়েছিলেন, শ্রীকাকুলামের সাথে নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে?''

ভ্যাবাচারা খেয়ে গেলাম । এ কীরে বাবা! এ লোকটা কি জানেও না শ্রীকাকুলামের ভাষা তামিল নয়। আর তা ছাড়া তামিল কবিতা পড়ার জন্য আজকাল তামিল না জানলেও চলে।

হৈ–হৈ কান্ড শুরু হয়ে গেল! ''অন্ধ্রে যোগাযোগ কর।''

সব্বনাশের মাথায় বাড়ি ! বেশি কথা বলার ফল।

কেন আজকালকার মানুষ দর্শনশাস্ত্র জানতে আগ্রহী নন, এটা বোঝাবার জন্য রাসেল খুব চমৎকার একটা উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণটা বাংলা করলে দাঁড়াবে– শেয়ালদাতে দাঁড়িয়ে এক পথিক একজন দর্শনিককে জিজ্ঞাসা করলেন।

'মশায় কলেজ স্ট্রিট যাবার সোজা রাস্তা কোনটা?''

দার্শনিক–'কলেজ স্ট্রিট?'

পথিক– 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

দার্শনিক–'কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা?'

পথিক– 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

দার্শনিক– 'সোজা রাস্তা?'

পথিক– 'আজ্ঞে হ্যাঁ?'

দার্শনিক –'জানি না তো!'

প্রশ্নের চরিত্র বুঝতে বুঝতেই দার্শনিকের সময় গেল। তখন পথিককে তো গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য অন্য পথ নিতেই হবে।

তরুণদের রাজনীতি– নিস্পৃহতা ঠিক কি এই কারণেই নয়? বিপ্লবীর বুলির আড়ালে শুধুই কচকচি আর রাস্তা দেখানোর সময় – 'করে নাও!'

হ্যাঁ ঠিকই, বেঁচে থাকার মত অসৎ হতে পারব না। আবার মরার মত ভীরুও নই, তাই জেলই আমার নির্দিষ্ট জায়গা। একটা বিপ্লবী পার্টিকে অবশ্যই গোপন পার্টি হতেই হবে– কিন্তু এই গোপন পার্টি, পার্টি সভ্যদের চারিত্রিক অবনতি ঘটাতে পারে। আত্মপরিচয় গোপনের মাধ্যম দিয়ে যে মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস শুরু হয়– সেটা বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায় পৌঁছে যায়– যে যত বেশিদিন গোপন থাকতে বাধ্য হয় সে তত বড় মিথ্যাবাদী হয়ে যায়। মিথ্যা কথা বলাটা অভ্যাস হয়ে যায়। হ্যাঁ, সত্যি–মিথ্যাকে আপেক্ষিক ধরেই বলছি। নাম বাবার নাম গোপনের মধ্য দিয়ে যে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়। পরে সেটা অভ্যাসই হয়ে যায়। অহেতুক মিথ্যা বলার একটা প্রবণতা দানা বাঁধে। এক কথায় এর বিরুদ্ধে সচেতন লড়াই চালাতে না পারলে এক একজন প্যাথেলজিক্যাল লায়ার তৈরি হয়।

(১লা অক্টোবর ১৯৮৭)

বাচ্চা বেলা থেকেই খুবই দুঃসাহসী ছিলাম। দুঃসাহসী লোক আর যাই হোক মিথ্যাবাদী হয় না। তা ছাড়া ছোট বয়সে মা শেখাতেন মিথ্যা বললে বাবা মারা যায়। এটা একটা সংস্কারই হয়ে গেছে। এটা এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস করে ফেলি।

প্রথম আত্মগোপন করার পর যখন শুনলাম বাবার গালে ক্যানসার হয়েছে, বুকটা ধক করে উঠল– এই যে আমি মিথ্যা কথা বলছি এর জন্যই বাবার ক্যান্সার হল। পাপ–পুণ্য বোধ থেকে নয়– কেমন একটা অপরাধবোধ থেকেই কথাগুলো মনে হয়েছিল। সহকর্মীদের হাসি–ঠাট্টায় ধাক্কাটা কাটালাম বটে; কিন্তু সংস্কারটা রয়েই গেছে।

গোপন পার্টি পরিচালনা করতে গিয়ে এর সব থেকে মারাত্মক দিক লক্ষ্য করেছি। অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা রিপোর্ট; সব সময়ই ধরা যেত না। অথচ ঐ রিপোর্ট–এর ভিত্তিতেই নির্দেশ দিতে হবে, কৌশল নির্ধারণ করতে হবে, ভুল তো হবেই, হতে বাধ্য। একটা সিদ্ধান্ত যখন সকলে মিলেই নিলেন যেই সেটা ব্যর্থ হল– অমনি তার দায়িত্ব একজনের ঘাড়ে চাপানোর প্রক্রিয়া তো ঐ প্রথম দিনেই শুরু।

খবর লিক করে যাকে ধরিয়ে দেওয়া হল সেই হল বিশ্বাস ভঙ্গকারী। কাকে দোষ দেব? পলিট্রিক্স আর পলিটিক্স যেখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে সেখানে তথাকথিত পলিটিক্সকে শত শত সেলাম।

তা হলে পথ কি?

প্রতিটি কর্মীর এই চারিত্রিক অধঃপতন '৭১ সাল থেকেই আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিকে গোপন পার্টির আবশ্যকতা, (বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার ঘটনা, এবং আমদের দেশে ছোটখাটো হলেও '৬২ সালের ঘটনার পর এটা যুক্তি–তর্কের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত

একটা সত্য হিশাবে স্বীকৃত।) অন্যদিকে তার সমস্ত কুফল। গোপন পার্টির কুফল নিয়ে অনেকেই অনেক আলোচনা করেছেন, আমার তো মনে হয় সবচেয়ে বড় কুফল কর্মীদের চারিত্রিক অবনতি। কোনো দ্বন্দ্বতত্ত্বের দুন্দুভি বাজিয়েই এটাকে জাস্টিফাই করা উচিত নয়।

বিচ্ছিন্নতাবোধ অনেক অপকর্মের জন্য দায়ী। এ নিয়ে জেলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করলাম। কেউ কোনো গুরুত্ব নিতেই রাজী হলেন না। তাঁরা সংস্কারের বশেই বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। কিন্তু গোপন কাজ করতে গিয়ে বার বার ধাক্কা খেতে শুরু করে তাঁদের মধ্যেও কারো কারো চিন্তাভাবনা শুরু হল। জেলের মধ্যে একটার পর একটা অঘটন ঘটতে শুরু করল। এমন কি একটা কাগজ-ও লুকিয়ে রাখা যাচ্ছেনা।

তখন তাঁদের বললাম, ''দেড়-হাতি গামছা পরে ঘোমটা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়, মুখ ঢাকতে গিয়ে পাছা বেরিয়ে যেতে বাধ্য''। এমন কিছু কাজ কর যাতে সাধারণ বন্দীদের আস্থা ফেরত আসে। একটু খোলা-মেলা আবহাওয়ার চালু কর। ''লিকেজ'' নয়, বিস্তৃতির অভাবই ধরা পড়ার কারণ। বিস্তৃতি থাকলে যত ''লিকেজ''ই হোক খুব একটা ক্ষয় ক্ষতি হবে না।

আবার ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে বিরোধিতা শুরু হলো। এর কারণ বিরোধীরা খোলা-মেলা বলতে এমন সব কাজ শুরু করলেন যাকে 'উলঙ্গ নৃত্য' বললেও কম বলা হবে। দুইই চরম। মুষ্টিমেয় আমরা কজন পড়লাম বিপদে।

সংস্কারমূলক কাজ না বন্দীদশা থেকে মুক্তির কাজ – কোনটা প্রধান? আমাদের বক্তব্য ছিল- মুক্তির কাজ-কে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সংস্কারমূলক কাজ। সব মানুষকে এই কাজে জড়িয়ে নেওয়া। কেউ সচেতনভাবে করবে কেউবা না জেনেই অংশ গ্রহণ করবে।

একজন ''বিপ্লবী'' হঠাৎ একটা চমৎকার কথা বললেন-'সংস্কারমূলক কাজ করবে সংশোধনবাদীরা, আমরা ফল ভোগ করব।'

অদ্ভুত কথা তো? আমার প্রায় 'ভিড়মি' খাবার অবস্থা! সামলে নিয়ে বললাম, ''সেকি। চিরকাল তো জানতাম লড়াই করেন বিপ্লবীরা, সংশোধনবাদীরা ফল ভোগ করে। আমাদের পার্টি কংগ্রেসও তো তাই বলল- মাধ্যপন্থীরা ফলটা আত্মসাৎ করল, তুই এটা কি বলছিস।'' সে গোঁ ধরে বসল।

মনে মনে বললাম- ''হায় খোদা! চারু মজুমদারকে চারু মজুমদারপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা কর। এরা লোকটাকে সন্ত্রাসবাদী বানিয়েই ছাড়বে!''

নীরো মার্কা হিরোর থেকে একজন জিরো মার্কা হৃদয়বান সাধারণ মানুষ যে অনেক বেশি মূল্যবান এটা কবে বুঝবে এরা?

ভুবনের ভার এই নীরো-মার্কা হিরোদের হাতে নেই। এরা শুধু পারে ইতিহাসের চাকাকে সাময়িকভাবে পেছনে টেনে রাখতে। ইতিহাস গড়ে আপাতভীরু হৃদয়বান মানুষগুলোই, হিরোরা নয়। হিরো সাজার প্রবণতার শিকার হতে দেখেছি কত সম্ভাবনাময় তরুণকে। আবার দেখেছি পাতি-হিরোদের কলরবে সত্যিকারের হিরোদের হারিয়ে যেতে।

মনে পড়ছে জুলিয়স ফুচিকের কথা, কে হিরো? একটা ছেলে জলে ডুবে যাচ্ছে দেখে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলেটা তার গলা জড়িয়ে ধরল, দুজনেই তলিয়ে যাচ্ছে। অন্য একজন একটা নৌকা জোগাড় করে দড়ি নিয়ে এগয়ি গেল, দড়িটা ছুঁড়ে দিল ডুবন্ত মানুষ দুটোর দিকে। দু-জনেই সে দড়িটা ধরে উঠে এল।

কে আসল হিরো?"

আমাদের শিল্প-সাহিত্য, সংবাদ- মাধ্যম প্রথম ব্যক্তির বীরত্বপনা প্রকাশেই ব্যস্ত। পুলিশ প্রশাসনের কাম্য এটাই। ওরাও এদেরই চেনাতে চায়, এদেরই তুলে ধরতে চায়- যাতে করে সকলেই ডুবে মরে।

ওরা এক ঢিলে দুটো পাখিই মারে। এরই জন্য আমি ফ্যানটম, অরণ্যদের প্রভৃতির বিরোধী। (কিঞ্চিত সংক্ষেপিত)

নির্বাচনে সিপিআই (এম) –কে
ঘায়েলে দিল্লীর নয়া কৌশল

– রমা প্রসাদ ঘোষাল

নির্বাচনে সিপিআই (এম) –কে ঘায়েলে দিল্লীর নয়া কৌশল

– রমা প্রসাদ ঘোষাল

দীর্ঘ ১৫ বছর পরে গত ৭ জানুয়ারি (১৯৮৯) কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে নকশালপন্থীদের প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশে ৭০ দশকের তিন নকশাল নেতা কানু সান্যাল, অসীম চ্যাটার্জি ও সৌরীন বসু নকশালপন্থীদের বহু ঘোষিত 'খতমের রাজনীতি'র তীব্র নিন্দা করলেন। সেদিনই কয়েক ঘন্টা বাদে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ১০ নং কনডেমড সেল থেকে চিকিৎসার জন্য নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত হলো সর্বাধিক বিপদজ্জনক চিহ্নিত নকশাল নেতা কমরেড আজিজুল হক।

নকশাল গ্রুপ দ্বিতীয় কেন্দ্রিয় কমিটির সর্বাধিক বিপদজ্জনক নেতা ১৭ বছরের জেলবন্দী আজিজুল হক খবরটি শুনে বললেন–''বিপ্লবীরা বিপ্লব করে, আত্মদান করে; আর গাছতলায় বসে পাকা ফল ভোগ করে সংশোধনবাদীরা। আসলে এখন নকশালপন্থীদের ২৫ টি গ্রুপের মধ্যে ২৩ টি গ্রুপ লাইন লাগিয়ে দিয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে (সি পি আই (এম)– এর রাজ্য পার্টি দপ্তর)। বাকি দু'একটি গ্রুপ যারা এর বাইরে বাস করেন; প্রতিনিয়তই তাঁদের ঘাড়ে নেমে আসছে শাসক দলগুলির বন্দুক বেয়নেট। তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট থাকছে জেলখানার 'লুপসি'। অন্যরা যাঁরা সংসদীয় রাজনীতির চোরাবালির ফাঁদে আটকে পড়েছেন, তাদের কেউ যাচ্ছেন ঝাড়খন্ডীদের সঙ্গে, কেউবা গোর্খাফন্টের সঙ্গে। তাই এখন বোধহয় নকশাল আন্দোলনের স্রষ্টা চারু মজুমদারকে বাঁচাতে হবে ইদানিংকার চারু মজুমদার পন্থীদের হাত থেকেই।''

জেলবন্দী নকশাল নেতা আজিজুল হকের ওই কথাগুলি তখনই স্মরণ করতে হবে, যখনই বর্তমান নকশাল আন্দোলনের হালহকিকৎ বলতে বসতে হবে। ১৯৬৯ সালে ২৯ জুন কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে নকশালবাড়ির মার্কসবাদী নেতা চারু মজুমদার ঘোষণা করেছিলেন নতুন কমিউনিস্ট দলের আত্মপ্রকাশকে। নকশালপন্থীদের তৈরি দলটির নাম দিয়েছিলেন সি পি আই (এম এল) অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)। সেদিন কমরেড হিসেবে তার পাশে ছিলেন নকশালপন্থীদের ডাকা রক্তাক্ত কৃষি বিপ্লবের ডাকসাইটের নায়করা– কানু সান্যাল, জঙ্গ সাঁওতাল, সন্তোষ রাণা, সত্যনারায়ণ সিংহ, অসীম চ্যাটার্জি, মহাদেব মুখার্জি, নিশীথ ভট্টাচার্য, আজিজুল হক প্রমুখ।

তারপর গত ২০ বছরে বাংলার নদীগুলো দিয়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের অনেক জল বয়ে গেছে। জেলখানায় চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর ভাঙতে ভাঙতে নকশালরা এসে পৌঁছেছে ২৫ টি ভাগে। কেউ গিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টে, কেউ গিয়েছেন নির্বাচন লড়তে; কেউ বা নেমে পড়েছেন পাল্টা সরকার তৈরি করতে। চারু মজুমদারের তৈরি সি পি আই (এম এল) প্রথম কেন্দ্রিয় কমিটিকে নকশাল নেতারা নিজেদের পছন্দ মতো ২৫ টি কমিটিতে ভাগ করে নিয়েছেন।

এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। হঠাৎই ৮০-র দশকের শুরুতে বামফ্রন্টের ক্ষমতা দখলের সুবাদে ১১ বছরের জেলবন্দী আজিজুল হক ছাড়া পেয়েই ঝিমিয়ে পড়া নকশাল আন্দোলনকে মোড় দেওয়ালেন চাঞ্চল্যকর পথে। নিশীথ ভট্টাচার্য, রমেন সাহা, কিশলয় ব্রহ্ম প্রভৃতি নেতাদের নিয়ে তৈরি করলেন দ্বিতীয় কেন্দ্রিক কমিটি। এবং সেই কমিটির নেতৃত্বে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা ও বর্ধমান জেলা জুড়ে ঘোষণা করা হল পাল্টা বিপ্লবী সরকার। চীনের বিপ্লবী পাটির ধাঁচে লাল ফৌজ তৈরির কথা ঘোষণা করা হল।

১৯৮২ সালে এই দ্বিতীয় কমিটি মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচন বানচাল করতে অপহরণ করল তদানীন্তন বিধানসভার বিরোধীদল নেতা কাশীকান্ত মৈত্রকে। চারটি জেলা জুড়ে শুরু হয়ে গেল রক্তাক্ত রাজনীতির দ্বিতীয় পাঠ। ফলত কড়া হাতে এদের দমন করতে বামফ্রন্টের পুলিশবাহিনী ১৯৮২ সালে ফের অ্যারেস্ট করল হককে। এবং এই দ্বিতীয় কেন্দ্রিয় কমিটিকে নকশালদের সবচেয়ে বিপজ্জনক গ্রুপ বলে মার্ক করা হল।

এখন নকশালপন্থীরা ২৫টি গ্রুপে বিভক্ত হলেও রাজ্য রাজনীতিতে মূলত তিনটি ধারায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রথম ধারায় সন্তোষ রাণা-সত্যনারায়ণ সিন্হার গ্রুপ সি পি আই (এম এল)। ফার্স্ট সেন্ট্রাল কমিটি ঝাড়খন্ডীদের সঙ্গে মিলেমিশে পাল্টা ঝাড় খন্ডী রাজ্য আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয় ধারায় একদিকে সমন্বয় কমিটি গড়ে কানু সান্ন্যাল, অসীম চ্যাটার্জি, মহাদেব মুখার্জি, অরিজিৎ মিত্ররা নিজেদের গ্রুপগুলো সংগঠিত করে সি পি আই (এম)-এর কৌশলে মিলিমিশে আন্দোলন না করে নির্বাচনের পথে যেতে চাইছেন। (ইতিমধ্যে এদের কেউ কেউ বামফ্রন্টের ধাঁচে গণফ্রন্ট গড়ে নির্বাচনী যুদ্ধে নেমেও পড়ছেন)।

আর তৃতীয় ধারায় নকশালপন্থীদের সর্বাধিক বিপদজ্জনক সংগঠক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আজিজুল হকের দ্বিতীয় কেন্দ্রিয় কমিটি এবং অন্ধ্রের পিপলস ওয়ার গ্রুপ এখনও জনযুদ্ধ সংগঠিত করার আশায় চারু মজুমদার প্রদর্শিত রক্তাক্ত রাজনীতির পথ আঁকড়ে ধরে আছে।

বর্তমান নকশাল আন্দোলনের উপরোক্ত তিনটি ধারার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক সি পি আই (এম) এবং প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস প্রথম ও শেষোক্ত ধারা দু'টিকে নিয়েই চিন্তিত। মধ্যপন্থী কথিত ওই দ্বিতীয় ধারাটিকে নিয়ে তাদের বা পুলিশ প্রশাসনের কোনই মাথা ব্যথা নেই। অবশ্য আই পি এফ-এর মধ্যে থাকা বিনোদ মিশ্রের আন্ডারগ্রাউন্ড নকশাল গ্রুপ 'পার্টি ইউনিট'-এর বিহারকেন্দ্রিক সংঘর্ষমূলক কাজকর্ম নিয়ে মাঝে মধ্যেই প্রশাসনিক ভাবনাচিন্তার উদয় হয়। রাজ্য শাসক দল আই পি এফ-এর বাড়বাড়ন্ত দেখে হালফিল বেশ আশংকিত।

নকশালদের প্রথম ধারাটির নেতৃত্ব এখন মূলত সন্তোষ রাণার হাতে। সি পি আই (এম) ফার্স্ট সেন্ট্রাল কমিটির নেতা একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র সন্তোষ রাণা আদিবাসী অধ্যুষিত মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার মানুষ। গত বিধাসভা নির্বাচনে ওই মহকুমরাই গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে তিনি নকশাল প্রার্থী ছিলেন।.......

যদিও শেষ পর্যন্ত সন্তোষ রাণার দলবল যেমন তাঁদের প্রস্তাবিত 'কলকাতা অভিযান'কে বাতিল করেননি, তেমনি রাজ্য সরকারের তরফে পুলিশও কলকাতায় নকশালপন্থী-ঝাড়খন্ডীদের প্রকাশ্য সমাবেশ বা মিছিল করার জন্য কোনরকম সংঘর্ষের রাস্তায় পা বাড়ান নি।

কলকাতা অভিযানের ব্যাপক সাফল্যের পরে সন্তোষ রাণার এই আদিবাসী ঝাড়খন্ডী রাজনীতির লাইনে 'বসে যাওয়া' নকশালকর্মীদের মধ্যে ভাল সারা ফেলে। সন্তোষ রাণাও প্রাক্তন 'বসে যাওয়া নকশালকর্মীদের' এক বিরাট অংশকে পাশে পেয়ে আগামী নির্বাচনকে লক্ষ্য করে উপজাতি-দলিতদের সঙ্গে নিয়ে হাঁটার লাইনটি জোরদার ভাবে মজবুত করে তুলতে পথে নামেন।

ইতিমধ্যেই একদিকে যখন দক্ষিণবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত জংগল মহলে সন্তোষ রাণার নকশাল গ্রুপের মিছিলে ঝাড়খন্ডী জংগী ছাত্র সংগঠন 'আজসু'র সমর্থকদের অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে, তখন অন্যদিকে দার্জিলিং হিল কাউন্সিল নিয়ে সন্তুষ্ট সুবাস ঘিসিং-এর জি এন এল এফ (গোর্খা ন্যাশনল লিবারেশন ফ্রন্ট) থেকে সদ্যবিচ্ছিন্ন জি ভি সি (গোর্খা ভলেন্টিয়ার কাউন্সিল)'র চীফ কনভেনর ছত্রে সুব্বা কলকাতায় ও ঝাড়গ্রামে সন্তোষ রাণার উপস্থিতিতে নকশালপন্থী ও ঝাড়খন্ডীদের সঙ্গে আলোচনা শেষে ঘোষণা করেন, 'জি ভি সি এখন থেকে নকশাল ও ঝাড়খন্ডীদের সঙ্গে যৌথ আন্দোলন চালাবে।' নকশালনেতা সন্তোষ রাণার পাশে বসে দার্জিলিং-এর এই জংগী গোর্খা নেতা আরও ঘোষণা করেন, ''কে বলে নকশালরা খুনী বা সর্বদাই সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী? আমি অন্তত পক্ষে তা বিশ্বাস করি না। নকশালপন্থীদের আমি শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি তাঁদের সর্বত্যাগী নেতা সন্তোষ রাণাকে। এখন থেকে এদের পাশে পাশে যুক্ত ভাবে আন্দোলন চালাবার কথা ভাবব।'' এইভাবে দক্ষিণবঙ্গ ঝাড়খন্ডীদের মধ্যে নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ছত্রে সুব্বা মারফৎ উত্তরবঙ্গেও সন্তোষ রাণা রাজনৈতিক জমিন তৈরি করতে নেমে পড়েছেন।

নকশালপন্থী নেতা সন্তোষ রাণা প্রমুখের সঙ্গে জঙ্গী গোর্খা নেতা ছত্রে সুব্বার রাজনৈতিক আঁতাত নিঃসন্দেহে আগামী নির্বাচনে একটি বিশেষ রেখাপাত করবে। কেননা, সন্তোষ-ঝাড়খন্ডী ও বিক্ষুব্ধ গোর্খা আঁতাত অবধারিতভাবে শাসক বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যাবে।

আবার, গত বিধানসভা নির্বাচনে নকশালদের যে গোষ্ঠীগুলি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের প্রগতিশীল অংশকে নিয়ে আই, পি এফ, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টের নেতৃত্বে গণফ্রন্ট তৈরি করে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াই চালিয়েছিল;তারা এখন কলকাতা, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও নদীয়া জেলার বিক্ষুব্ধ সি পি আই (এম) গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে পাল্টা তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আর এই উদ্যোগটি সফল হলে নিঃসন্দেহে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। কেননা, সম্মিলিত ভাবে বামফ্রন্টের শতকরা ভোটপ্রাপ্তি হল ৫২ শতাংশ। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের শতকরা ৪২ শতাংশ। তাই এ সময় যদি নকশালপন্থীরা 'গণফ্রন্ট'কে বিস্তৃত করার মধ্য দিয়ে সব গোষ্ঠীর নকশালদের নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট তৈরি করতে পারে, তাহলে একদিকে তারা সঙ্গে পাবে ঝাড়খন্ড, জনতা পার্টি ও এস ইউ সি আই-কে, অন্যদিকে সঙ্গে পাবে বামফ্রন্টের দুই বিক্ষুব্ধ শরীক আর এস, পি ও ফরোয়ার্ড ব্লককে। যাদের একাংশ এখনও জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সি পি এম-এর বড় দাদাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য লড়াই ফ্রন্টের মধ্যে থেকেই চালিয়ে যাচ্ছে।

নকশালপন্থীদের গ্রুপগুলির মধ্যে যে দু'টি ধারা সংসদীয় পথ ধরে ক্রমান্বয়ে জনমানসে জায়গা করে নিচ্ছে তাদের একটি হল সন্তোষ রাণা ও সত্যনারায়ণ সিন্হার গ্রুপ এবং অন্যটি হল নাগভূষণ পট্টনায়েক এবং বিনোদ মিশ্রের গ্রুপ ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট —

সংক্ষেপে আই পি এফ। বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্র প্রদেশে এদের রমরমা। স্থানীয় ভিত্তিতে নানান ফ্রন্টে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে আই পি এফ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে জনতার বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে।

আই-পি-এফ-এর ২০-২৩ মার্চ ১৯৮৮তে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনের দলিলে বলা হয়েছে ৪৬৯ জন পুরষ এবং ৩৮ জন মহিলাসহ মোট ৫০৭ জন ১১টি রাজ্য থেকে তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ১২০ জন পর্যবেক্ষক। উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৯২ জন ছিলেন সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী, এদের রাজনৈতিক পটভূমিকা ছিল সিপিআই (এম-এল)-৮৯, সিপিএম-৫১, সিপি আই-৪২, জনতা-১৩, কংগ্রেস-৯, ডি এম কে-৮, বি জে পি-১, আর এস এস-৪, বি এস পি-২, দলিত প্যান্থারস-৩, সোশ্যালিষ্ট পার্টি-৯ এবং অন্যান্য বামপন্থী পার্টির ৭ জন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কি হারে আই-পি-এফ এগিয়ে চলেছে।

ওড়িশার নাগভূষণ পট্টনায়েকে স্থায়ী 'ব্রেন চাইল্ড' আই-পি-এফ-এর প্রাণপুরুষ। কিন্তু বিহারের নকশাল গ্রুপ 'পার্টি ইউনিট'-এর অদৃশ্য নায়ক বিনোদ মিশ্র। যদিও আই-পি-এফ-এর পদাধিকারী নেতারা প্রকাশ্যে তা স্বীকার করেন না।

সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই জানেন যে, দু'টি রাজ্যে সরকার নকশাল উপদ্রব নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তাদের একটি হল অন্ধ্রপ্রদেশ এবং অন্যটি হল বিহার। বিহারে নকশালরা তো এখন দলিত অত্যাচারিত কৃষকদের নিয়ে সশস্ত্র কৃষিসেনাও তৈরি করেছেন। বিহারের জেলায় জেলায় নকশালদের গেরিলা কায়দায় সশস্ত্র হামলায় ইতস্ততঃ মারা পড়ছে জোতদার বাহিনী, যার অন্য নাম 'ভূমি সেনা'। একে দমন করতে বিহার সরকার অন্ধ্রের রামা রাও সরকারের ধাঁচে নকশাল দমনে ''পুলিশী মাষ্টার প্ল্যান'' বানিয়েছেন। নকশাল অধ্যুষিত হাইওয়েতে অবিরাম টহল দিচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্রধারী পুলিশ। তবু দমানো যায়নি নকশালদের। যেমন যায়নি অন্ধ্রপ্রদেশের 'পিপলস্ ওয়ার' গোষ্ঠিকে।

নকাশপন্থীদের এ হেন রহস্যময় রবিন হুডের তাবৎ লোকজন এখন আই-পি-এফ-এর পতাকাতলে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা স্বীকার করুন বা নাই-ই করুন, আই-পি-এফ হল তাঁদের প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনের প্ল্যাটফরম।

পশ্চিমবঙ্গে এই আই-পি-এফ-এর কর্ণধার হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরিজিৎ মিত্র এবং বাসুদেব বসু। দু'জনেরই ব্যক্তিজীবন যে কোন রাজনীতিবিদের অনুকরণ যোগ্য (অবশ্য আজিজুল হক ও বিনোদ মিশ্র ব্যতিক্রম)। এ রাজ্যে এই দুই নেতার নেতৃত্বে আই-পি-এফ মূলতঃ তাদের শক্তি সংহত করেছে ছাত্র, যুব এবং শ্রমিক ফ্রন্টে। এরা মাঝে মধ্যে নির্বাচনও লড়েছেন। যেমন খোদ অরিজিৎ মিত্রই গত সাধারণ নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্রে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন, ইঞ্জিনিয়ারদের সংস্থা 'ফেটো'র আন্দোলন এবং স্কুল কলেজ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে অংশ নিয়ে আই-পি-এফ জবরদস্ত সংগঠন গড়ে চলছে। যদিও এইসব সংগঠনে আরও অন্যান্য নকশাল গ্রুপগুলি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক-অরাজিনৈতিক বিশ্বাসীরাও সামিল আছেন। সম্প্রতি আই-পি-এফ-এর বৃহৎ শক্তি সংগ্রহ হল নদীয়ার জনপ্রিয় নকশাল নেতা রমেন সাহাকে সঙ্গে পাওয়া। এই রমেন সাহাই ৮১-৮২ সালে 'নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্ত বিপ্লবী সরকার' নামে আজিজুল

আজিজুল হকের সঙ্গে কৃষ্ণনগর থেকে পাল্টা সরকার তৈরির কথা ঘোষণা করেন। এবং স্বীকৃত রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রিয় সরকারকে বেআইনী আখ্যা দেন। আজিজুলের প্রেরণায় রমেন সাহা ওই পাল্টা সরকারের অধীনে চারটি সশস্ত্র সেনাবিগ্রেড তৈরির কথাও ঘোষণা করেন। গুজব রটে ইনিই অপহরণ করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতাকে। তারপরই রাজ্য সরকারের পুলিশ এঁকে কৃষ্ণনগর থেকে গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে রমেন সাহা আই-পি-এফ-এ যোগ দেন। সঙ্গে যোগ দেয় তাঁর নদীয়ার জংগী ইউনিট।

এরপর নদীয়ার পুলিশ রাইফেল ছিনতাই-এ নাম যুক্ত করে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারও করে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তিনি জেলে আছেন.। জেলখানায় তিনি সাংবাদিকদের জানান, ''রাজ্য সরকার পুলিশ দিয়ে এইভাবে যদি অন্যায় হামলা চালায়, তাহলে আমরা আবার রাইফেল হাতে তুলে নেব।'' আই-পি-এফ নেতার এই হুঁশিয়ারি রাজ্যের রাজনৈতিক মহলকে ভাবিয়ে তুলছে। এতো আর বরকত গণিখান চৌধুরীর স্টেনগান হাতে তুলে নেওয়ার কাগুজে ডাক নয়। রমেন সাহা ফাল্‌তু কথা বলার মানুষ নন। তিনি যা বলেন, তাই করেন।

আর তাই যদি হয়, যদি বিনোদ মিশ্রের মত তিনিও আই-পি-এফ-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীরা যদি সত্যি সত্যি রাইফেল হাতে তুলে নেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ নকশালবাড়ির মত আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে। পরিণত হবে আজকের বিহারের জাহানাবাদ কিংবা আজকের অন্ধ্র প্রদেশের পি-ডবলিউ-জি'র এলাকাগুলির মত রক্তাক্ত অধ্যায়ের। তার উপর মধ্যপ্রদেশের বস্তার সংলগ্ন জঙ্গলে, ওড়িশার কোরাপুট, মহারাষ্ট্রের গদচিরোলি, বিহারের জাহানাবাদ, আসামের কোকারাঝাড়, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া প্রভৃতি এলাকা গুলিতে নাকি বিদ্রোহী নাগা এন-এস-সি-এন এবং বিদ্রোহী মিজো এম-এল-এফ-এর কাছ থেকে সংগৃহীত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অস্ত্র শিক্ষার ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছে নকশালপন্থী পি ডবলিউ জি এবং পার্টি ইউনিট।

আর তা নাকি এই ১৯৮৯ সালে সারা ভারত জুড়ে একটা ব্যাপক সশস্ত্র আক্রমণের জন্য। এই উড়ো খবর যদি সত্যি হয়, তাহলে যে কোন মুহূর্তে সারা ভারত জুড়েই রক্তাক্ত রাজনীতির সর্বাত্মক অধ্যায় শুরু হয়ে যেতে পারে। যা বিহারের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে চীনের মত গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে হামলে পড়বে।

আই-পি-এফ যেভাবে গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন চালাচ্ছে তাতে যদি রক্তাক্ত রাজনীতির পথে তারা পা নাও বাড়ায় এবং সংসদীয় পথে নেমে ব্যাপক ভাবে 'থার্ড ফ্রন্ট' গড়ে নির্বাচনের নামে, তাহলেও এ রাজ্যে এবং বিহারে ব্যাপক রাজনৈতিক বদল ঘটে যেতে পারে। আই-পি-এফ-এর ১৯৮৮ সালে ২০-২৩ মার্চ দিল্লীর শহীদ ব্রজেশ নগরের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনের দলিলে সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই দলিলে কংগ্রেসকে রুখতে বৃহত্তর বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রয়োজনে নির্বাচনের রাস্তাতেও নেমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

প্রায় এরকমই একটি পথ ধরেছেন সন্তোষ রাণা। এই দুই পথের দুই ধারার কি মিল হতে পারে? কে জানে, তা বলবে ভবিষ্যৎই। তাহলে আজিজুল হক? আজিজুল হক আমাদের প্রতিনিধিকে বলেছেন —''শুনেছি রাজ্য সরকার নাকি আমাকে নিয়ে লেখাটি প্রকাশ হবার পরই পাহারা বাড়াবার চিঠি দিয়েছেন। তবে ওরা যতক্ষণ না আঁচায় ততক্ষণ বিশ্বাস নেই। কি বিহার কি পশ্চিমবঙ্গ দুই সরকারেরই এক ভূমিকা। এই একদিকে বলছে মুক্তি দেবে,

অন্যদিকে আমাকে নিয়ে লেখা প্রকাশ হবার পরই পাহারা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছেমত সকলে আমার কাছে আসতে পারছেন না। আটকে দেওয়া হয়েছে নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতির লোকজনকে।

''তবু যদি জেল থেকে মুক্তি পাই প্রথমে বাইরে যাব চিকিৎসার জন্য। তারপরে ফিরে এসে শোষিত মেহনতি মানুষদের সংগঠিত করব। আমি মাঠে প্রান্তরের সেই রাত্রিকালীন জাগালদার;যে চিৎকার করে জাগিয়ে দেয় কৃষককে তার ফসল রক্ষার জন্য, প্রাপ্য রক্ষার জন্য।''

দক্ষিণবঙ্গের নকশালদের একটি বিশিষ্ট গ্রুপের নেতা হলেন মহাদেব মুখার্জি সি পি আই (এম এল)। তেমনি উত্তরবঙ্গের ও-সি-সি-আর গ্রুপের বেস লীডার হলেন কানু সান্যাল। সত্তর দশকে এই দুই নেতাই নকশাল আন্দোলনে কিংবদন্তীর রাজপুত্র বলে চিহ্নিত হতেন। এঁরা সকলেই এখন সর্বত্র নকশালপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে যাচ্ছেন। কানু সান্যাল তো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সমন্বয় সমিতি পর্যন্ত গড়েছেন। সম্প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসে বোলপুরে তাঁদের সর্বভারতীয় অধিবেশন হয়ে গেল। সেখানে রাজনৈতিক প্রস্তাবে ''আগামীদিনে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস এবং সংশোধনবাদী সি পি আই (এম)এর বিরুদ্ধে ব্যাপক রাজনৈতিক লড়াই লড়তে দ্রুত নকশালপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সার্বিক শক্তি নিয়োগ করতে হবে'' বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

লক্ষ্য করার বিষয় হল কানু সান্যালের প্রয়াসে এখানেও সন্তোষ রাণার মত ঝাড়খন্ডীদের পৃথক রাজ্য আদায়ের দাবিকে সমর্থন করা হয়। শ্রী সান্যাল বিতর্কিত গোর্খা আন্দোলন তথা গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সন্তোষ রাণার মত প্রকাশ্যেই সমর্থন করেছিলেন। যোগাযোগ করার পর তিনি সুবাস ঘিসিংকে বলেছিলেন, ''কুক্রী দিয়ে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড আদায় হবে না, বরং কর্মীদের রাইফেল ধরতে শেখান, তাতে কাজ হবে।'' কানু সান্যালের এই বক্তব্য কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি ভাল মনে নেন নি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সন্তানের কাছে তিনি বাঙালি স্বার্থ-বিরোধী বলেই চিহ্নিত হয়ে গেছেন।

নকশালদের একাংশের 'শ্রদ্ধেয় নেতা' মহাদেব মুখার্জি বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলিকে কখনই প্রকাশ্যে সমর্থন জানান নি। তিনি একক শক্তিতে নিজের সমর্থকদের সংগঠিত করে বিভিন্ন জেলার সাংগঠনিক পকেটে স্থানীয় ইস্যুকে কেন্দ্র করে নিয়মিত আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। সেটা অবশ্যই তাঁর প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু এই দু'জনে যদি সত্যি উদ্যোগী এবং অগ্রণী হন এবং ঝাড়খন্ডী সমর্থিত সন্তোষ রাণা এবং ছাত্রযুবফ্রন্টে সর্বাধিক শক্তিশালী আই-পি-এফ যদি এদের সঙ্গে হাত মেলান তাহলে পশ্চিমবঙ্গে একটি পাল্টা বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হতে পারে।

এদিকে গত সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গেছে। সেই নির্বাচনে নকশালপন্থী নেতা সন্তোষ রাণা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা সি পি আই (এম)-এর শীর্ষনেতা জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে 'সাতগাছিয়া' বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তখন ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন জনপ্রিয় নেতা সর্দার আমজাদ আলি। ওই নির্বাচনে মুসলিম লীগ সন্তোষ রাণাকে অতি আশ্চর্যজনক ভাবে সর্বাত্মক সমর্থন করে। আর ওই নির্বাচনে বাঘা দুই নেতার মধ্যেকার নির্বাচনী লড়াই-এর মাঝখানে পড়েও সন্তোষ রাণা হাবুডুবু খাননি। বরং অতীব সম্মানজনক ভাবে হেরেছিলেন।

এখন মুসলিম লীগ রাজ্য রাজনীতিতে একটি নির্ণায়ক শক্তি। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্তত ১০০টি কেন্দ্রে তার সমর্থন একটি বিশেষ ফ্যাক্টর। নকশাল নেতা সন্তোষ রাণাকে সমর্থন প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের সভাপতি বিধায়ক হাসানুজ্জমানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ''সন্তোষ রাণা ধর্ম নিরপেক্ষ নেতা হিসাবে আমাদের দাবি দাওয়াকে সমর্থন করেছেন, তাই দলগত ভাবে আমরাও তার নির্বাচনী লড়াইকে নিজেদের লড়াই বলে ভেবে নিয়েছি।'' এটা খুবই সত্যি যদি আগামী নির্বাচনে সন্তোষ রাণার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে পাল্টা বামপন্থী ফ্রন্ট গড়া হয় এবং তাতে যদি মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি (এস ইউ সি আই, আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক) অংশ গ্রহণ করে তাহলে পশ্চিবঙ্গের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থীদের একমাত্র নির্বাচিত পুরবোর্ড (মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড) আছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন তথা বোলপুর পুরসভা। বোলপুর বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এই জেলার প্রভাবশালী বামফ্রন্টমন্ত্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল বামফ্রন্ট শরীক ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা। ভক্তিবাবুর সঙ্গে নকশালদের দহরম মহরম এখনও রাজ্য রাজনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু। রাঢ়বঙ্গে নকশালপন্থীদের বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গেই তার ভাল সম্পর্ক। সম্প্রতি ফ্রন্টে সি পি আই (এম) এর অভিভাবক–সুলভ দাদাগিরিকে কেন্দ্র করে অন্যতম শরীক আর এস পি'র সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকও প্রকাশ্যে সি পি আই (এম) বিরোধিতা নির্বাচনে রিগং–এর অভিযোগ করা এবং জ্যোতি বসুর বিরোধিতা শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে বেঙ্গল ল্যাম্প এবং টেকস্‌ম্যাকো কোম্পানি সম্পর্কিত দু'টি গুরুতর অভিযোগ উথাপন করে আর এস পি নেতা পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী তো পদত্যাগ পর্যন্ত করেছেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর উক্ত দুই শরীকের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী সরল দেব, সমবায় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল, এবং দুই আর এস পি নেতা কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ও সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই বামফ্রন্টের বড় শরীক সি পি আই (এম)–এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করেছেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এর পিছনে নাকি বিভিন্ন নকশালপন্থী গোষ্ঠগুলির সমর্থন ও তৃতীয় ফ্রন্টের ধারণা বেশ ভালভাবেই কাজ করছে।

সত্তর দশকের রক্তাক্ত রাজনীতির নায়ক নকশালপন্থীরা যে রাজ্য রাজনীতিতে ভালভাবেই প্রভাবিত করে, তা পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন, ইঞ্জিনিয়ারদের ধর্মঘট, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ছাত্র রাজনীতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এসব জায়গায় বিভিন্ন আন্দোলনের কারণে যাদের আটক করা হয়েছে তারা প্রায় সকলেই নকশালপন্থী। বোলপুরে নকশালপন্থী নেতার হত্যার প্রতিবাদে খোদ শান্তিনিকেতনে বন্ধ পালিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কলেজ, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ, ইন্ডিয়ান পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পি জি) ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানে নকশালপন্থীদের আধিপত্য এবং শান্তিনিকেতন সংলগ্ন বোলপুর পুরসভা নির্বাচনে নকশালদের জয় এবং নদীয়ার নকশালদের ডাকা বন্ধে প্রায়শ সাফল্য পশ্চিমবঙ্গে নকশাল পুনরুত্থানেরই কথা প্রতিষ্ঠিত করে।

এখন যদি এই বহুধাবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ ভাবে বামফ্রন্টের সি পি এম এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াই শুরু করে এবং আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস

ইউ সি আই, মুসলিম লীগ তাকে সমর্থন করে তাহলে রাজ্য রাজনীতির মানচিত্র বদলে যেতেই পারে।

সম্প্রতি সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় যে হারে প্রধান শাসক দল সি পি আই (এম) থেকে পদত্যাগের হিড়িক বাড়ছে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বামশাসনে বাঁকুড়ার সুচাঁদ সোরেন, মেদিনীপুরের মনোরঞ্জন রায়, নদীয়ার ফকির মহম্মদ, বীরভূমের বনমালী দাস, ২৪ পরগণার অনিমেষ চৌধুরী ও দমদমের সুধীর ভট্টাচার্য–এর মত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সি পি আই (এম) ছেড়ে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন,) তাতে সি-পি আই (এম) ত্যাগী বিক্ষুব্ধ ও সি পিএম–এর আগ্রাসী রাজনীতির বিরোধী বামশরীকদের নিয়ে জেলায় জেলায় বিভিন্ন নকশালপন্থী নেতারা স্থানীয় ইস্যুকে ভিত্তি করে 'নাগরিক কমিটি' গড়ে (হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও মালদা জেলায় ইতিমধ্যেই গঠিত) রাজ্য রাজনীতিতে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে আসন্ন নির্বাচনে সি পি আই ও সি পি আই (এম)–এর যৌথ উদ্যোগকে পথে বসাবার প্রস্তুতি তৈরি হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

কারণ বাংলার বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ জানেন যে নকশালদের এই তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার উদ্যোগকে যদি আলিপুর সেন্টাল জেলের ১০ নং নির্জন সেল থেকে ১৭ বছরের জেলবন্দী আজিজুল হক একটি খোলা চিঠি দিয়েও সমর্থন করেন, তাহলে সার্বিক নকশাল ঐক্যের নৈতিক সমর্থনে বলীয়ান সম্মিলিত নকশালশক্তির কাছে সি পি আই– সি পি এম এর যৌথ সংসদীয় শক্তি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কেননা, আজিজুল হকের এই দ্বিতীয় কেন্দ্রিয় কমিটিই এ রাজ্যের সাধারণ যুবকদের মনে ৭০ দশকীয় নকশালপন্থীদের লড়াকু স্মৃতিটিকে জাগিয়ে রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের একাংশ এখনও মনে করেন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার টুকরো মৃত্যুপাগল নকশাল ছেলেরা যত বিভ্রান্তই হোক না কেন, তাঁদের আদর্শটা ছিল দরিদ্র মানব মুক্তির। যদি সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সত্যিই কোন তৃতীয় ফ্রন্ট তৈরি হয় তাহলে ওই জনতার থার্ড পাওয়ার রাজনীতিগত কারণে বাধ্য হবে তৃতীয় ফ্রন্টকে সাপোর্ট করতে। আর একালের রক্তের তেজ কমে আসা নকশাল নেতারা এখন সেরকমই রাজনৈতিক রাস্তা বেছে নিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। রাজ্য রাজনীতির তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য অপেক্ষা এখন।

[নিবন্ধের অর্থবহ নামকরণ সম্পাদকের–লেখকের নয়। –সম্পাদক]

‘ভারতে কোন সাচ্চা
কম্যুনিষ্ট পার্টি নেই’
—কমরেড কানু সান্ন্যাল

'ভারতে কোন সাচ্চা কম্যুনিষ্ট পার্টি নেই'

–কমরেড কানু সান্ন্যাল

[রক্তাক্ত নকশাল আন্দোলনের স্রষ্টা কমরেড চারু মজুমদারের অন্যতম বিশ্বস্ত কমরেড এবং দক্ষিণহস্ত হিসেবে যে নামটি এককালে বারংবার উচ্চারিত হতো তিনিই হোচ্ছেন কমরেড কানু সান্যাল। কমরেড জ্যোতি বসুর সিপিআই (এম) থেকে বেরিয়ে আসার পর যেসব বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট নেতা ১৯৬৯ সালের ২৭ শে এপ্রিল ১১ সদস্য বিশিষ্ট সিপিআই (এম–এল)–এর প্রথম সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন, কমরেড কানু সান্ন্যাল ছিলেন তার সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য। সর্বোপরি ১৯৬৯ সালের ১লা মে কোলকাতার ময়দানে আয়োজিত প্রকাশ্য জনসভায় এই কমরেড কানু সান্ন্যালই সিপি আই (এম–এল) পার্টি গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন।

উল্লেখ যে, ১৯৭২ সালের ২৮ শে জুলাই কোলকাতার পুলিশ হেড কোয়ার্টার লালবাজার–এর লক আপে চারু মজুমদারের মৃত্যুর মাস তিনেক পর ৪ঠা নভেম্বর জেল থেকে নকশালপন্হী ছ'জন নেতা যথাক্রমে কানু সন্ন্যাল, তেজেশ্বত রাও, সৌরেন বসু, নাগভূষণ পট্টনায়ক, কোলা ভেংকাইয়া এবং ভূবনমোহন পট্টনায়ক এক ১১–দফা সম্বলিত বিবৃতিতে প্রয়াত চারু মজুমদারের থিসিস–এর সমালোচনা ও মূল্যায়নের আহবান জানান।

কিন্তু মাত্র পাঁচ মাস পরে সহকর্মীদের হতবাক কোরে কমরেড কানু সান্ন্যাল তাঁর রচিত ''মোর এ্যাবাউট নকশালবাড়ি''–তে প্রকাশ্যেই চারু মজুমদারের তীব্র বিরোধীতা করেন। অনেক গবেষকের মতে এসময় কানু সান্ন্যালের চিন্তারাজ্যের বিচ্যুতি পূর্ণ অবয়ব ধারণ কোরেছে।

এসবের প্রায় দেড় যুগ পরে আমরা বিশেষ কোরে পশ্চিম বঙ্গের প্রকাশ্যে রাজনীতিতে কমরেড কানু সান্ন্যালকে এক ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখতে পেলাম। এককালের বিপ্লবী কানু সান্ন্যালের এই পরিবর্তন হোচ্ছে সংশোধনবাদী হিসেবে। কমরেড অসীম চ্যাটার্জি আর কমরেড সৌরীন বসুর সক্রিয় সহযোগিতায় কানু সান্ন্যাল নকশাল ঐক্যের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ৭ জানুয়ারী কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এক সম্মেলন আহবান কোরলেন। মূল উদ্দেশ্য হোচ্ছে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন এবং আসন্ন নির্বাচনে পৃথকভাবে অংশ গ্রহণ। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টা কমরেড জ্যোতি বসুর সিপি আই (এম) সরকারের জন্য বেশ কিছুটা চিন্তার কারণ বৈকী! এসব কিসের আলামত?

এধরেনের এক প্রেক্ষিতে সম্প্রতি ভারতীয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কমরেড কানু সান্ন্যালের দেয়া গুরুত্বপূর্ণ এই সাক্ষাৎকার পাঠকদের সুবিধার্থে পুনরমুদ্রিত করা হলো––সম্পাদক]

প্রশ্ন ঃ সিপিআই(এম)–এর একটা অংশ যখন নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু করে তখন আপনি সিপিআই(এম)–এ ছিলেন। তবে কেন আপনি সিপিআই (এম)–এর উপর এতো তিক্ত?

উত্তর : আমরা অবিভক্ত সিপিআই (এম)–এর সদস্যরা তখন শোধনবাদ এবং ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিলাম। সেই সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে ক্রুশ্চেভের শোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছিল। ভারতবর্ষে, শোধনবাদ এবং ডানপন্থীদের লড়াইয়ের ফলশ্রুতিই সিপিআই ভেঙ্গে সিপিআই (এম)–এর গঠন। কিন্তু সিপিআই (এম) যখন কর্মপন্থা স্থির করল, তখন দেখা গেল তাঁরা ডানপন্থীদের সঙ্গে সমঝোতা এবং নতি স্বীকার করেছে।

প্রশ্ন : তাঁরা সমঝোতা করেছে, সেটা কেমন করে বলছেন?

উত্তর : তাঁরা সশস্ত্র লড়াই পরিত্যাগ করেছে এবং জমি সংক্রান্ত লড়াইয়ে জনগণকে নিরুৎসাহিত করেছে। অর্থাৎ তাঁরা মার্কসবাদ– লেলিনবাদকে হেয় করেছে।

প্রশ্ন : যেহেতু আপনারা শ্রেণী শত্রুকে শারিরীকভাবে খতম করেন, সেজন্য আপনাদের আন্দোলন কি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রিয় নয়?

উত্তর : সেখানে ব্যক্তি বিশেষকে বর্জনের কোনও প্রশ্ন ছিল না। এটার সঙ্গে শোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই–এর কোনও সম্পর্ক নাই। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭–এর মধ্যবতী সময়ে সিপিআই (এম)–এর ভিতর তিনটে লাইনে ভাবনা চিন্তা চলছিল। একটা ছিল নেতৃত্বের প্রচারিত শোধন বাদের লাইন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চারু মজুমদার প্রচারিত নৈরাজ্যবাদী পথ। এবং তৃতীয় পথ হল সেই বিপ্লবী অংশের যাঁরা শোধনবাদ এবং নৈরাজ্যবাদ দুইয়েরই বিপরীত; বিপ্লবী অংশের শ্লোগান ছিল ''লাঙল যার জমি তার।'' এই উদ্দেশ্যে, বড় জমিদারের সম্পত্তি জোর করে বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছিল। এবং আমাদের অস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছিল পুলিশের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য। গোটা আন্দোলনে মাত্র একজন পুলিশ অফিসার, একজন সাধারণ পুলিশ ও একজন জমাদারকে হত্যা করা হয়েছিল। প্রতিশোধ স্বরূপ সিপিআই (এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে ৩০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনারা এবং চারু মজুমদারের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিতদের হাতে তবে কেন এত মানষ খুন হয়েছিল?

উত্তর : আমি অনেক ঘটনাই জানি; কিন্তু তার মধ্যে এখন যেতে চাই না। প্রত্যেক পদ্ধতিরই একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। প্রথম অবস্থা শেষ না করে পরের অবস্থায় যাওয়া যায় না।

প্রশ্ন : যখন নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়, তখন একজন সিপিআই (এম) নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারকে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, যে, অস্ত্র ধারণ করে আপনারা শ্রেণী শত্রুর চেয়ে কমিউনিষ্টদেরই বেশী ক্ষতি করছেন........।

উত্তর : বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থীদের শোধনবাদ এবং বামপন্থীদের শৌখিনতা একই ব্যাপার, যা মার্কসবাদ– লেলিনবাদকে আদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে বিরোধিতা করে। ১৯৬৬ সালে আমাদের আন্দোলন ছিল চূড়ান্ত অবস্থায়। বিচার্য বিষয় ছিল; আমরা ভোটে অংশ নেব কিনা? যদি সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাই মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারব কি ? আমাদের

উদ্দেশ্য কি হবে? এই সব সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম। আমাদের পথ বামফ্রন্ট সরকারকে বিব্রত করেনি।

চারু মজুমদার ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন এবং স্কোয়াডকে বলেছিলেন জমিদারদের খতম করতে, আমরা এর বিপক্ষে ছিলাম। আমাদের সরকারে অংশ গ্রহণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভূমি সংস্কার আন্দোলনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে। কিন্তু আমরা কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে কিছু জানতাম না।

চারু মজুমদার নিজেকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিত করাতে পেরেছিলেন। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ''কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব রেভিলেশনারিজ'' গঠন হয়েছিল। এই কমিটি গঠনের সাথে সাথে বেশ কিছু মানুষ চারু মজুমদারের বিরোধীতা করেন। জেলে থাকাকালীন আমি সদস্য ছিলাম না। ১৯৬৯ সালের ৯ই এপ্রিল আমি জেল থেকে ছাড়া পাই এরং কমিটি মিটিং-এ যোগ দিই। যখন আমি সিপিআই (এম-এল) গঠনের কথা ঘোষণা করি, তখন আমি চারু মজুমদারের হাতের অস্ত্রে পরিণত হচ্ছিলাম। ১৯৭২ সালে জুলাইয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে বলেছিলাম, নকশালবাড়ি আন্দোলনে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ এবং মাও-এর চিন্তাধারার বদলে আমরা ওই সময় নৈরাজ্যবাদের চর্চা করেছি।

প্রশ্ন ঃ এখন আপনার কর্মপন্হা কি?

উত্তর ঃ আমরা মার্কসবাদ, লেনিনবাদ এবং মাও-এর চিন্তাধারার পক্ষে। ভারতে কোনও প্রকৃত কমিউনিষ্ট পার্টি নেই। রাজনীতিগতভাবে বিশ্বাস করি সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে কোন কৃষি আন্দোলন ১৯ ৬৭ সালের অবস্থাকেই ফিরিয়ে আনবে। সংগঠনগতভাবে, আমরা এখনও পর্যন্ত একটা পার্টি গড়ে তুলছি। সে কারণে মেহনতি মানুষকে সংগঠিত করছি।

প্রশ্ন ঃ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে আপনার মত কি?

উত্তর ঃ সিপিআই (এম) স্টেট মেশিনারিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, যেমন অন্যান্য রাজ্যে করে কংগ্রেস (ই)। যদিও প্রধান শত্রু কংগ্রেস (ই), তবু শোধনবাদকে পরিত্যাগ না করে কেউ একটা শ্রেণীর উন্নতি করতে বা গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালাতে পারে না। (তারা সিপিআই এম) মনে করে, সংস্কারের মাধ্যমে তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং সেটাই এই পদ্ধতির একটা অংশ। তারা শোধনবাদকে একটা পদ্ধতির মধ্যে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আপনার মত?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নটি সব সময় বুর্জোয়াদের কাছ থেকে আসে। এবং ওটাই গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ভারতের প্রেক্ষাপটে যা করছে খেটে খাওয়া মানুষ। আমরা বিশ্বস করি, এক জাতীয়তাবাদ অন্য জাতীয়তাবাদকে দমন করে না, করে সামাজতান্ত্রিক ফাঁদ।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু শিখরা বলছে, তারা অন্য জাতির দ্বারা দমিত হচ্ছে?

উত্তর : তারা যাই বলুক। আমরা কিন্তু তাদের আলাদা জাতি মনে করি না। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান তৈরি করে ভুল হয়েছিল। অবিভক্ত সিপিআই-এর পাকিস্তান প্রশ্নে বোঝাটাও ছিল ভুল। আমরা জাতীয়তাবাদের লড়াইকে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমর্থন করি।

প্রশ্ন : গণ আন্দোলনে আপনার অ্যাপ্রোচ কি?

উত্তর : বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, লকআউট, অপসংস্কৃতি, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে যুবক, কৃষক এবং মহিলাদের সংগঠিত করে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভের সংস্কার সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর : আমরা তাঁর চিন্তার বিরোধিতা করি। গর্বার্চেভ ক্রুচেভের পথে হাঁটছেন, যদিও খুবই সূক্ষ্মভাবে। তিনি মার্কসবাদে বাধা দিচ্ছেন না, কিন্তু মার্কসবাদকে পশারিণী করে তুলেছেন।

প্রশ্ন. : সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টদের একটা বড় অংশ মনে করছেন যে তাঁর সংস্কার মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিস্তৃত সীমার মধ্যেই।

উত্তর : এটা ঠিক নয়। উদাহরণ হিসেবে গর্বাচেভের থিয়োরির কথাই ধরা যাক যে, যুদ্ধ ছাড়া রাজতন্ত্রে বাস করা সম্ভব । কিন্তু আমরা জানি যে রাজতন্ত্রের পরিতুষ্ট ওই শ্রেণী শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত হবে না। রাজতন্ত্র মানেই যুদ্ধ।

প্রশ্ন : চীনের সংস্কার সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর : আমাদের একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন হবার কথা আছে পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। এখনও আমরা চীন সম্পার্কে শেষ কথায় পৌঁছতে পারিনি।

প্রশ্নঃ কিছু কমিউনিস্ট মনে করে ভারতে বিপ্লব পরিচালনা করবে প্রলেতারিয়েতারা, যে রকম হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। যখন অন্যরা মনে করে, বিপ্লব হবে কৃষিভিত্তিক, যেমন চীনে হয়েছিল। কোন মডেল অনুসরণ করতে চান?

উত্তরঃ আমরা চীন ভিয়েতনাম এবং অক্টোবর বিপ্লব থেকে শিক্ষা নেব। তবে ভারতীয় বিপ্লব ভারতীয় পথ অনুসরণ করে চলবে। প্রতিটি বিপ্লবেরই নিজস্ব চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চূড়ান্ত পথ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেশের চলতি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে।

প্রশ্নঃ প্রায়শ অভিযোগ করা হয় যে আপনারা বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে থাকেন?

উত্তর : এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ শুনতে আমরা অভ্যস্ত । ১৯৬৫ সাল থেকে আমরা শাসক দলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলিনি। তাই আমাদের পাকিস্তানি এজেন্ট বলা হতো। পরে আমাদের চীনের এজেন্টও বলা হয়। কিন্তু ১৯৭০ সালে সেই চীনের নেতা চৌ এন লাই আমাদের নানাভাবে সমালোচনা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু চীন আপনাদের নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

উত্তর ঃ কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৬৭ সাল থাকে ৬৯ সাল পর্যন্ত আমরা চীনের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্যই পাইনি।

প্রশ্ন ঃ যদি আপনাদের বিদেশ থেকে কোনরকম সাহায্য করা হয় তাহলে কি আপনারা গ্রহণ করবেন?

উত্তর ঃ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে সাহায্য এলে আমরা তা খারিজ করে দেব।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের বর্তমান রাজনৈতিক স্ট্যান্ড কি?

উত্তর ঃ আমরা রাজীবের পতন চাই। এই কারণে যে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙন ধরাবার জন্য আমরা আগ্রহী। আমরা বৃহত্তর বিরোধী ঐক্য চাই যার মধ্যে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী পার্টিও যারা কিনা সংশোধনবাদ এবং প্রয়োজনে রাজীবকে সাহায্য করে থাকেন। ১৯৬৯ সালে সিপি আই এবং সিপিআই (এম) কংগ্রেসকে হটিয়ে দেয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বামপন্থী সংগ্রাম এবং ঐক্যের প্রতিনিষ্ঠাবান।

প্রশ্ন ঃ ভারতবর্ষে কি বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তাহলে তা কখন?

উত্তর ঃ মাও বলতেন, আমরা ভেড়ার মুখোশ দেখছি। ভেড়া জলে থাকতে পারে না। তাকে তীরে পৌছতেই হবে, হয় আগামীকাল না হয় পাঁচ বছরের পর, না হয় পাঁচিশ বছরের পর। সেইমত ভারতেও বিপ্লবের ভবিষ্যৎও খুবই উজ্বল।

জ্যোতি বসুর অমোঘ অস্ত্র ঃ
কমঃ আজিজুল হকের মুক্তি

—বিকাশ কুমার ঝা

জ্যোতি বসুর অমোঘ অস্ত্র ঃ কমঃ আজিজুল হকের মুক্তি

—বিকাশ কুমার ঝা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নকশালবন্দী আজিজুল হককে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সব কেস বিশেষ উদ্যোগে তুলে নিলেও, সম্প্রতি সমস্যা দাঁড়িয়েছে নতুন একটি দিকে। আজিজুলের নামে বেশ কিছু কেস রয়েছে বিহারে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যদি আজিজুলকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহলেও বিহার সরকারের কেসগুলি তুলে না নেওয়া পর্যন্ত আজিজুল সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবেন না। সাম্প্রতিককালে বিচারধীন আজিজুলকে বন্দী করে রাখা বিষয়ে চারদিক থেকে এভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে যে লেফট ফ্রন্ট সরকার বাধ্য হয়ে আজিজুলকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমন কি জ্যোতি বসু আজিজুলের উপর থেকে কেসগুলি তুলে নেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন ভগবত সিং ঝা আজাদকে চিঠি লেখেন।

জ্যোতি বসুর অনুরোধে আজিজুলের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলি তুলে নেওয়া হবে কিনা সে নিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। পুলিশ অফিসারদের বক্তব্য — আজিজুলকে মুক্তি দেবার পর যদি তিনি পুনরায় হিংসাত্মক নকশাল আন্দোলন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন, তাহলে সরকারের কাছে অসুবিধেজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

সুতরাং উচ্চপর্যায়ের চিন্তা–ভাবনা করার পরই আজিজুলের উপর থেকে বিহার সরকার মামলাগুলি তুলে নেবেন কিনা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপাতত বিহার সরকারের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে আজিজুলের মুক্তি। আজিজুলকে মুক্তি দেবার বিষয়ে প্রশ্ন করলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী 'আলোকপাত'কে বলেন, ''এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি আমি পেয়েছি। এখন আজিজুলের বিরুদ্ধে আনা কেসগুলিকে আগাগোড়া খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে আজিজুলকে মুক্ত করলে নতুন কোন বিরূপ সমস্যার উদ্ভব হতে পারে কিনা।''

আজিজুলকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে বিহার সরকারের এতখানি চিন্তা ভাবনা করার কারণ কি জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৬ জুন ১৯৮২ তারিখে। সি পি আই (এম–এল) দ্বিতীয় কেন্দ্রিয় কমিটির নেতা নিশীথ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করে এনে বিহারের সিবান জেলার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে সি আই বি'র এক জাহাবাজ অফিসারের সামনেই অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। একটানা ৯৪ ঘন্টা জাগিয়ে রেখে নিশীথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পুলিশ যে জবানবন্দী টেপ করে তা শেষ পর্যন্ত দলের মধ্যে এতখানি বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে নিশীথ কল্পনাও করতে পারেননি।

জবানবন্দীতে নিশীথ বলেছিলেন, ''আমাদের সহযোগীরা ভুল রাস্তায় হাঁটছেন। সহযোগীদের আমি বারবার বলেছি লেনিনের মতাদর্শে সহিংস কোন দল হিসেবে নকশালকে গড়ে তোলা হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের কমরেডরা গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণ করে সামন্তশ্রেণী উৎখাতে লেগে পড়েছে, বিরোধ বাধাচ্ছে পুলিশের সঙ্গে। সহযোগীরা কেউই আমার কথায় পাত্তা দেয় না। আমার রাস্তা তাই তাদের রাস্তা থেকে আলাদা হয়ে গেছে।''

সেই জবানবন্দীতে নিশীথ ভট্টাচার্য এমন কিছু কথা বলে ফেলেন যা সি বি আই অফিসারেরা পরে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের কাজ হাসিল করে। এর ফলে পুলিশ আজিজুল, রমেন সাহার মত নকশাল আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছাড়াও অসংখ্য সক্রিয় নকশাল কর্মীকে সহজেই গ্রেপ্তার করে। নিশীথ ভট্টাচার্যের জবানবন্দী একদিকে যেমন নকশাল কর্মীদের হতোদ্যম করে তেমনি অন্যদিকে নিশীথের বিতর্কিত জবানবন্দীকে অস্ত্র হিসেবে খাড়া করে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনকেও ঠান্ডা করে

এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন কলকাতার চতুর এক সি আই বি অফিসার নাম রজত মজুমদার। নকশাল আন্দোলনকে শায়েস্তা করবার জন্য তিনি মনে মনে রণনীতি ছকে নেন। বিহার থেকে নিশীথ ভট্টাচার্যের জবানবন্দী ক্যাসেট করে কলকাতার বন্দী নকশালপন্থীদের শোনালেন কূটনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। এদিকে প্রিয় নেতার জবানবন্দী শুনে বন্দীরা মুষড়ে পড়লেন। কেউ কেউ ফেটে পড়েলেন ক্ষোভে।

সবচাইতে ক্ষুব্ধ হলেন দলের সেন্টাল কমিটির ঘনিষ্ঠ নকশালপন্থী তাপস সরকার, যাকে বিহার থেকে ফিরেই গ্রেফতার করলেন রজত মজুমদার। খবরে তখন এও প্রকাশ ছিল, নিশীথ ভট্টাচার্যই পুলিশকে সাহায্য করেন। নিশীথ ভট্টাচার্যের জবানবন্দী টেপে শোনার পর তাপস তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। দলীয় নেতৃত্বের উপর রাগে, ক্ষোভে, যন্ত্রণায় সে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাপসের গ্রেফতার কূটনীতিক পুলিশের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালিয়ে যাবার পর ২৫ মে ১৯৮২ সালে নিশীথ ভট্টাচার্য ও আজজুল হক বিহারের সিবান জেলার সতবারা গ্রামে নকশালবাড়ী দিবস পালনের জন্য এসেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের বিশিষ্ট নকশাল নেতৃবৃন্দ। তৎকালীন নকশাল নেতৃত্ব মনে করেছিলেন সতবারা গ্রাম নকশাল আন্দোলনের কর্মপীঠ হিসেবে উপযুক্ত হবে। সেইমত কাজও শুরু হচ্ছিল। কিন্তু সতবারার জমিদার নকশালদের সন্দেহজনক গতিবিধির খবর জানিয়ে দেন সিবান পুলিশ স্টেশনে। তখনও অবশ্য জমিদার জানতেন না এঁরা কারা। ২৫ মে যখন একটি ঝুপড়িতে নিজেদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা রত ছিলেন তখন পুলিশ এসে উপস্থিত প্রত্যেককেই গ্রেফতার করে. কথাবার্তা শুনে পরে যখন পুলিশ বোঝে যে এরা চোর ডাকাত নয় তখন কাউকে গ্রেফতার না করেই ফিরে যায়।

২৭ মে (১৯৭৬) সতবারার বৈঠক শেষ করার পর যখন নিশীথ ভট্টাচার্য এবং গোরা ভট্টাচার্য (যার নামে এক সি আই ডি অফিসারের হত্যার মামলা ছিল) সিবানে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, চোরের পিছু ধাওয়া করতে করতে ভুল করে পুলিশ ওদের পাকড়াও করে। নিশীথ বার বার চেষ্টা করেও পুলিশকে সেদিন বোঝাতে পারেননি যে তাঁরা চোর ডাকাত নন।

নকশাল আন্দোলনের পুরোধা নেতৃত্ব নিশীথ ভট্টাচার্য, প্রধানতম নেতা চারু মজুমদারের আহবানে একদিন স্ত্রী পুত্র ছেড়ে দলে যোগ দেন। অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী নিশীথ অল্প সময়ের মধ্যেই দলের দায়িত্বপূর্ণ পদে উঠে আসেন। ১৯৭০ সালে যখন তৎকালীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় নকশাল আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করেছিলেন সে সময়ে নিশীথ ছিলেন সি পি আই (এম-এম)-এর সাধারণ সদস্য। তাঁকে জেলে বন্দী

করা হয়। ৪ বছর জেলে কাটাবার পর ১৯৭৬–এ প্রেসিডেন্সী জেল থেকে নিশীথ পলায়ন করেন। কিন্তু পুনরায় তিনি ধরা পড়েন। ১৯৭৭ সালে বাম ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর অবশ্য নিশীথকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিশীথ ছাড়া পাবার পরেই আবার নকশাল আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হন। কিন্তু দলের অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেন, ''আমাদের উদ্দেশ্যহীনতার চাইতে বড় উদাহরণ কি হতে পারে যেখানে সাধারণ লোক ভাবে আমরা উগ্রপন্থী একটি দল গঠন করছি।''

১৯৮২ সালের গোড়ার দিকে নিশীথ এবং আজিজুলের নেতৃত্ব নকশাল আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছিল অনেক পথ। কিন্তু ২৭ জুন ১৯৮২তে ইন্দ্রনাথ বক্সী, পরের ২৮ তারিখে আজিজুল হক এবং ১২ জুলাই তারিখে রমেন সাহার গ্রেফতার কর্মস্রোতকে বলতে গেলে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

নদীয়া কৃষ্ণনগরের প্রভাবশালী নেতা রমেন সাহার নাম জড়িয়ে ছিল পশ্চিম দিনাজপুরের বন্দুক লুঠের ঘটনার সঙ্গে। তাছাড়া জনতা পার্টির নেতা কাশীকান্ত মৈত্র অপহরণ উপাখ্যানের মূল হোতা ছিলেন সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য রমেন সাহা–ই।

২৮ জুন হঠাৎই পুলিশ খড়দহ এলাকার একটি প্রেস ঘরে হানা দিল। এই প্রেসেই নকশালদের মুখপাত্র 'দেশব্রতী' ছাপা হত। প্রেসের সাধারণ কর্মীরা ভেবেছিল পুলিশ 'দেশব্রতী' তুলে দিতে এসেছে। কিন্তু পুলিশ সোজা ছুটে গেল এক সাধারণ চেহারা কর্মীর দিকে। এই মানুষটিই হলেন আজিজুল হক।

ইনিই ২৪ ফেব্রুয়ারী '৭৬–এ প্রেসিডেন্সী জেল ভেঙেছেন, অনেক যুদ্ধের নায়ক ইনিই। জেল ভেঙে পালাবার সময় পুলিশের ছোঁড়া গুলি পর্যন্ত আজিজুলকে থামাতে পারেনি। ১৯৭৭–এ আজিজুল ও নিশীথ , তৈরি করেছিলেন দ্বিতীয় সেন্ট্রাল কমিটি।

১৯৭৮ এই নবগঠিত নকশাল পার্টির প্রথম বৈঠক হয় নিউ জলপাইগুড়িতে। এই বৈঠকে পশ্চিম দিনাজপুরের সুবীর তালুকদার, শান্তি পাল, মালদার অনিল বরণ রায়, প্রমুখ সকলেই ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তি পাল ও আজিজুল–নিশীথের মধ্যে মতান্তর দেখা দেয়। বিহারের কাটিহারের পরাণপুরে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় বৈঠকে শান্তি পাল মহাদেব মুখার্জিকে সঙ্গে করে নতুন দল ঘোষণা করেন। দলীয় মতভেদ দেখা দেওয়ায় ১৯৭৯তে আজিজুল বিহারের অর্জুন ব্যানার্জি, কৃষ্ণনগরের রমেন সাহা, মালদার অনিল বরণ রায় প্রমুখের সাহায্যে একের পর এক হিংসাত্মক কার্য কলাপ চালান।

ঐতিহাসিক নদীয়া বন্ধ, পশ্চিম দিনাজপুরের বন্দুক লুঠ, বিহারের হিংসাত্মক কার্যকলাপ, কলকাতার সি পি এম অফিসে বোমা ফাটানোর অভিযোগে আজিজুলের নামে একের পর এক মামলা চাপানো হয় বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয় রাজ্যেই। ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৭–এর বামপন্থী সরকার কিছু দিনের জন্য আজিজুলকে মুক্তি দিলেও পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিচারাধীন নকশালবাদী আজিজুলের জীবনের সতেরটি বছর পার হয়ে গেছে কারা অন্তরালে। আজিজুলের নামে কোন অভিযোগে কত কেস রয়েছে, আজিজুল নিজেই তা জানেন না। রোগাক্রান্ত শরীরে নীলরতন মেডিক্যাল কলেজে চলছে তাঁর চিকিৎসা।

আজিজুলের মুক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মানুষেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভাস্কর রায় চৌধুরী, কবি শংখ ঘোষ, চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন প্রমুখ

স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুক্তির দাবি তুলেছেন কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি, ভোলানাথ সেন, অজিত পাঁজা ছাড়াও বহু বিশিষ্ট নেতা।

ইতিমধ্যে বিহার সরকারের কাছেও আজিজুলের মুক্তির জন্যে আবেদন জানিয়েছেন প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী, শৈবাল মিত্র, কংগ্রেস নেতা ভোলাথ সেন প্রমুখ।

[নিবন্ধের অর্থবহ নামকরণ সম্পাদকের —লেখকের নয়। —সম্পাদক]

নকশালদের রক্তাক্ত ইতিহাস
এখন বিস্মৃতির অন্তরালে
—নির্মল ঘোষ

নকশালদের রক্তাক্ত ইতিহাস এখন বিস্মৃতির অন্তরালে

–নির্মল ঘোষ

১৯৬৭–র শেষ দিকে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্ত চেহারাটা স্পষ্টত লক্ষিত হয়। পার্টির সদস্য সংখ্যাও কমতে থাকে। সি পি আই (এম)–এর নিজস্ব পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯৬৪ সালে পার্টির সদস্য ও প্রার্থী সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,০৬,৩১৩ ও ১২,৩৭০ যেটা ১৯৬৮–র প্রারম্ভে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৫,৪০২ এবং ১১,০২৩ জনে এবং অনস্বীকার্য যে এই ঘটনা মুখ্যত আন্তপার্টি সংঘর্ষেরই ফল। পার্টির মাদুরাই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মতের সঙ্গে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যে মতপার্থক্য ছিল এবং যাকে তৎকালীন বামপন্থী অংশ 'সংশোধনবাদ'রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, ১৯৬৮–র এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বর্ধমান প্লেনামে পার্টির মধ্যে সংঘর্ষ গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও, নেতৃত্ব সে প্রস্তাবটিকেই কার্যত দাখিল করলেন।

ফলে সোভিয়েট লাইন ও চীনা লাইন থেকে প্রায় সমদূরত্ব বজায় রেখে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রয়াস এই প্রস্তাবে স্পষ্টতর হোল। এবং সোভিয়েট দৃষ্টিভঙ্গীর বিবেচনায় এই ক্ষমতা প্রস্তাব ছিল সংশোধনবাদবিরোধী আর চীনা দৃষ্টিতে এটা ছিল পরিপূর্ণ সংশোধনবাদী। এই প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে সি.পি. আই (এম) ভারতীয় বিপ্লবের স্তর ও কৌশল সংক্রান্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে ডাঙ্গেবাদীদের শ্রেণী সমঝোতার সংশোধনবাদী পথ পরিত্যাগে সমর্থ হয়েছে। ....

বৰ্দ্ধমান প্লেনামে গৃহীত এই প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে যে আলোচনা বা বিতর্ক চলে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা কার্যত অংশ নিতে পারেন নি । কারণ দলবিরোধী কার্যকলাপের কারণে তাঁদের অনেককেই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

এই প্রকারে বহিষ্কৃত প্রায় চারশ সদস্যের মধ্যে ছিলেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু , সুশীতল রায় চৌধুরী, পরিমল দাশগুপ্ত, অসিত সেন,সরোজ দত্ত প্রমুখেরা। পার্টির দার্জিলিং জেলা কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি বর্ধমান প্লেনামে যে মনোনীত প্রতিনিধিদের পাঠায়, তাঁদের সকলেই ছিলেন উক্ত প্রস্তাবের সপক্ষে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পার্টি থেকে বহিষ্কৃত বামপন্থীদের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। তাঁরা ইতিমধ্যেই 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটি' গঠন করেছিলেন। তাদের ইংরেজি মাসিক 'লিবারেশন'–এর 'নোটস্' কলামে লেখা হয়ঃ

''যা আশা করা গিয়েছিল, ইদানীং বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সি.পি.আই. (মার্ক্সবাদী)–র কেন্দ্রীয় কমিটির তথকথিত প্লেনাম এমন এক আদর্শগত রাজনীতিক পন্থাকে চূড়ান্ত সমর্থন জানাল, যা মূলত সংশোধনবাদী। কিছুকাল আগেই চীনের কমরেডরা বলেছিলেন, বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সামনে যে সমস্যাগুলি আছে, সেগুলি বিষয়ে যারা আজ নিরপেক্ষ, তারা শীঘ্রই সুবিধাবাদের পথ গ্রহণ করবে এবং পরিণামে যোগ দেবে প্রতিবিপ্লবী শিবিরে। যতদিন চলছিল মহান আদর্শগত সংগ্রাম, মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ও সংশোধনবাদের মাঝামাঝি থেকে সি.পি.আই.এম.–এর নেতারা নিরপেক্ষ থাকার ভান করছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাজে ও কথায় প্রমাণ থাকছিল, যে তাঁরা এক সংশোধনবাদী, প্রতিবিপ্লবী পন্থা নিয়েছেন।

''প্রথমে মাদুরাই ও পরে বর্ধমানে, আদর্শগত প্রশ্নগুলি প্রসঙ্গে বক্তব্য যে খুলে বলতে হয়েছে, সে ভালই। কিন্তু মার্ক্সীয় লেনিনীয় নীতির প্রতি তাঁদের কপট বিশ্বস্ততা এবং সি-পি-এস-ইউ-এর নেতৃত্বের চক্রান্তের সংশোধনবাদী তত্ত্ব ও নীতির প্রতি তাঁদের অকপট সমর্থন, এ দুয়ের সংযোগ ঘটাতে এই সব কৌশলী ও ধূর্ত লোক প্রাণপণ চেষ্টা করেন। মার্ক্সীয় বাক্‌ছটাজালে তারা তাঁদের বেইমানিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছেন বটে , কিন্তু সে মুখোশ তাঁদের স্বরূপ লুকাতে সামান্যই সক্ষম হয়েছে। গত বছর নকশালবাড়ী কৃষক বিদ্রোহ এই নয়াসংশোধনবাদী চক্রান্তের প্রতিবিপ্লবী চরিত্রটি আগেকার সব কিছু থেকে অনেক কার্যকরীভাবে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। এ আর গোপন নেই যে এই সব লোক, কৃষকদের সংগ্রামকে রক্তে নিমজ্জিত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির হাতিয়ার হিসাবে, তাঁদের রাষ্ট্র প্রশাসন যন্ত্রের অংশ হিসাবে কাজ করছেন। প্রতিক্রিয়ার এইসব দালাল, যাঁরা মার্ক্সবাদী বলে মুখোশ পরে বেড়ান, বর্ধমান তাঁদের মুখোশ খুলে ফেলার কাজ সম্পূর্ণ করেছে...''

সি পি (এম)-এর উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অন্য উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয় অন্ধ্রের রাজ্য কমিটির দ্বারা। জানুয়ারী, ১৯৬৮-তে অনুষ্ঠিত অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য প্লেনাম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের খসড়াটি ১৫৮-৫২ ভোটে নাকচ করে তাঁরা দাবী করেন যে, চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির জুন, ১৯৬৩-র বক্তব্যের লাইনে পুরো প্রস্তাবটি পুনরায় লিখতে হবে। এবং এই মর্মে টি. নাগি রেড্ডি, সি. পুলা রেড্ডি এবং কোনো ভেনকাইয়া দুটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অন্ধ্র গোষ্ঠির এই প্রস্তাবে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবিত রাজনৈতিক এবং নীতিগত দু'একটি বিচার্য বিষয়ে মতভেদ ছিল না বরং, ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন বিষয়ক সমস্ত মৌলিক প্রশ্নেই তাঁদের মতভেদ ছিল বর্তমান।......

'অন্ধ্র কমরেডদের কাছে চিঠিতে পলিটব্যুরো কেন্দ্রীয় প্লেনামের প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে কাজে লাগাতে ও পার্টির নিয়মানুবর্তিতা ও ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানান। পরিবর্তে নাগি রেড্ডি ও তাঁর সহযোগীরা 'পার্টি সদস্যদের কাছে খোলা চিঠি' নামীয় পুস্তিকায় সি.পি.এম. নেতৃত্বের 'নয়া-সংশোধনবাদী লাইন', 'সুবিধাবাদী নীতি' 'ডাঙ্গে সংশোধনবাদীদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট' 'পার্লামেন্টারী পথের প্রতি আসক্তি' ও 'সংগ্রামী শক্তির বিরোধিতা', ইত্যাদি কার্যাবলীর নিন্দা করা হয়।

ফলে নাগি রেড্ডি , পুলা রেড্ডি , ভেঙ্কটেশ্বর রাও, কোলা ভেনকাইয়া প্রমুখ অন্ধ্র পার্টির নেতৃবৃন্দ পার্টি থেকে বহিস্কৃত হলেন। উক্ত প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের বহিস্কার প্রসঙ্গে তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরায়া মন্তব্য করেছিলেন যে এর ফলে অন্ধ্রে কমিউনিস্ট আন্দোলন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশগুলিতে পড়বে। তাঁর এ মন্তব্য অচিরাৎ সত্য প্রমাণিত হয়। বহিস্কৃত ও দলত্যাগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৮,০০০-এ। পশ্চিবঙ্গের মোট ১৬,০০০ সদস্যের মধ্যে ৩,০০০ নকশালবাদী আন্দোলনে যোগ দেন এবং ৪,০০০ নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। পি. সুন্দরায়ার বিবৃতি অনুযায়ী দলত্যাগীর সংখ্যা ছিল নিম্ন প্রকারঃ

রাজ্য	মোট সদস্য সংখ্যা (১৯৬৭)	দলত্যাগীর সংখ্যা
জম্মু ও কাশ্মীর	৮০০	৮০০
পাঞ্জাব	৬০০	১০০
দিল্লী	৪০০	১৫০
বিহার	২,৬০০	৩০০
উড়িষ্যা	৮০০	১৫০
মহারাষ্ট্র	২,৩০০	১৫০
তামিলনাড়ু	৮,৫০০	১,৩০০
পঃ বঙ্গ	১৬,০০০	৭,০০০
অন্ধ্র	১৬,০০০	৮,০০০

সি.পি.আই (এম) থেকে নকশাল পন্থীদের এই বেরিয়ে যাবার ঘটনা হরশঙ্কর কাপুর-এর মতে চার বছর আগে সি.পি.আই থেকে ''মার্ক্সবাদী''দের বেরিয়ে যাবার ঘটনার প্রায় এক হুবহু পুনরাবৃত্তি। তিনি লিখেছেন, 'সেদিন সি.পি.আই (এম)-পন্থীরা আপসপন্থী সি.পি আইয়ের আগড় ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং অনেক পরিমাণে বিপ্লবী চিন্তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর মাত্র চার বছর পরে সি.পি.আই (এম)-এর নেতৃত্ব নিজেই হয়ে পড়লেন আপসপন্থী এবং প্রাণপণে চেষ্টা করলেন কী করে বিপ্লবী চিন্তার অগ্রগতি রুদ্ধ করা যায়- যে অগ্রগতিকে অনিবার্য করে তুলেছিলো ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক কাঠামোর দ্রুত বেড়ে চলা সংকট।

''আরো একবার মাথা চাড়া দিলো ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আধা ঔপনিবেশিক পেটি বুর্জোয়া চরিত্র- তার '' এক পা আগে দুই পা পিছে'' মানসিকতা, তার আপসপ্রেম, বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা এবং লুঠের মাল ভাগাভাগি করে নেওয়ার লোভ, যে বিরোধের কিছুতেই মিটমাট হয় না তাকে মিটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা, তার অনড় কর্তৃত্ববাদ। তবে, ১৯৬২-র তুলনায় এইবার তার আধা ঔপনিবেশিক পেটি বুর্জোয়া চরিত্রের অভিব্যক্তিটা ছিলো অনেক বেশি মারত্মক।.... প্রাদেশিক স্তরে সামন্ত বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়ার ফলে, এবং সংসদীয় পথে আরো অনেক কিছু পাবার স্বপ্নে ডুবে থাকায় সি.পি.আই (এম) নেতৃত্বের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো একই সঙ্গে তার আপসী নীতি ''আঁকড়ে থাকা ও নকশালপন্থী বিক্ষুব্ধদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। সুতরাং বিদ্রোহে অটল নকশালপন্থী অংশটিকে তাঁরা পার্টি থেকে বহিষ্কার করলেন।''

সারা ভারত কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি গঠন

জুন ১০, ১৯৬৭-তারিখের বেতার প্রচার মারফত চীনা ভয্যকার সি.পি.আই (এম)-এর নেতৃত্বকে কার্যত বাতিল করে দেয়। নেতৃবৃন্দ স্বভাবতই একে পার্টি ভাঙবার জন্যে আমেরিকার প্রচার হিসাবে ধরে নেন; অথবা বলেন যে সেটা হোল লিউ শাও চি গোষ্ঠীর মনোভাব যা কখনোই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য হতে পারে না।

এর প্রায় তিন সপ্তাহ পরে সি.পি.আই (এম)-নেতৃবৃন্দ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে, ''নকশালবাড়ী সংগ্রাম বিষয়ে পিকিং রেডিও প্রচারিত মূল্যায়নের সবটুকুই আমাদের পার্টি প্রদত্ত মূল্যায়ন হতে পৃথক।'' কিন্তু জুলাই ৫ তারিখের 'পিপলস ডেইলি' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (Spring Thunder Breaks Over India) নকশালপন্হীদের (কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশ) কাজ ও পথকেই সঠিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এবং এই সঙ্গে সি.পি.এম-কে ''আধুনিক সংশোধনবাদী'' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। প্রাক প্লেনাম (১৯৬৮) কালে উপরোক্ত চীনা মূল্যায়ন পার্টির বিপ্লবী অংশের কাছে অবশ্যই ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সংহতি ও নতুন দল গঠনের কাজেও এই উক্তির প্রেরণা ছিল সবিশেষ। তদুপরি উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিই সমকালে ও পরবর্তীকালে নকশালপন্হীদের চিন্তাচর্চ্চায় ও নীতিনির্ধারক দলিলগুলি রচনার ক্ষেত্রে মুখ্য পথ প্রদর্শক হয়ে দাঁড়ায়।........

১৯৬৭ সালের জুলাই মাস থেকে সি.পি.আই (এম)-এর বহিষ্কৃত ও দলত্যাগী সদস্যেরা সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 'দেশব্রতী' এবং মাসিক ইংরেজি কাগজ 'লিবারেশন' প্রকাশ করতে থাকেন; মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'নয়া সংশোধনবাদী'দের (সি.পি.এম) বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে কয়েকটি প্রদেশের 'কমরেডরা' কলকাতায় এক সভায় মিলিত হন এবং সারা ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি (All India Co-ordination Committee of the Revolutionaries) গঠিত করেন।

এই কমিটির ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে কমরেড লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এদেশে এখন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত। কিন্তু সি.পি.আই (এম)-এর নয়া সংশোধনবাদী নেতৃত্ব জনগণ ও পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন; এরা শ্রেণী-সমঝোতা ও পার্লামেন্টারী পথের মোহে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করেছেন। নিরপেক্ষ ব্যাখ্যার নামে তারা আমাদের দেশের নয়া-ঔপনিবেশিক চেহারা এবং এর আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র আর সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কৌশল ও রণনীতি পরিত্যাগ করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এদেশে স্বাধীন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশলাভ ঘটেছে এবং ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র এখনো হারায় নি। আর এইভাবে তারা মাও সে-তুঙের বিশ্ববিপ্লবের, বিশেষত এশিয়া, আফিকা ও লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের পরিকল্পনাকে, যা অত্যন্ত সংহতভাবে প্রকাশ করেছিলেন কমরেড লিন পিয়াও, নস্যাৎ করেছে।

বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাদের নিরপেক্ষতার 'মধ্যপন্হা' কার্যত ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদকেই সমর্থন। এভাবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে টিটোবাদের বীজ বপন করা হোল, যা পরিণামে মাদুরাই প্রস্তাবে প্রকটিত। পার্টি পতাকার তলে দাঁড়িয়ে বারংবার বিপ্লবী কমরেডরা লড়াই করেছেন এবং প্রত্যেকবারই তারা সংশোধনবাদের শিকার হয়েছেন। নকশালবাড়ী আর ইতিহাসের এক নতুন বাঁক হিসাবে পার্টি এবং দেশের ক্ষেত্রে স্মরণীয় ।.....

বর্ধমান প্লেনামের পর, নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকীতে (মে ১৪, ১৯৬৮) সারা ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি এক সভায় মিলিত হন এবং পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কমিটি নাম পরিবর্তন করে, নতুন নামকরণ করেন ''সারা ভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি '' (All India Co-ordination Committee of

Communist Revolutionaries) এবং একটি নতুন ঘোষণাপত্রও প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রের মূল বিষয়বস্তু হোলঃ

(১) স্বাধীনতার পূর্বে ভারত ছিল বৃটেনের উপনিবেশ ; বর্তমানে সেই ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নয়া উপনিবেশে পরিণত হয়েছে।

(২) বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী–সাম্রজ্যবাদী ব্যবস্থা চূড়ান্ত ধ্বসের মুখে; আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতে (ক) সাম্রাজ্যবাদী নয়া উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির ও জনগণের দ্বন্দ্ব, (খ) সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীগুলি ও কৃষকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব এবং (গ) মুৎসুদ্দি আমলতান্ত্রিক পুঁজি ও শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছে।

(৩) ভারতীয় জনগণের প্রধান শত্রু হচ্ছে; (ক) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, (খ) সোভিয়েত সংশোধনবাদ (গ) ভারতের জমিদারশ্রেণী এবং (ঘ) মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণী । ''এরা হচ্ছে চারটি পাহাড় যা আমাদের মেহনতী জনগণের পিঠের ওপর গুরুভার হয়ে চেপে রয়েছে।''

(৪) উপরোক্ত চারটি শত্রুর 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ' শাসনের উচ্ছেদের ওপর 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' সাফল্য নির্ভর করছে। সেই উদ্দেশ্যে (ক) শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীকে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল তৈরি করতে হবে (খ) দীর্ঘকালীন সশস্ত্র লড়াই চালাতে হবে, (গ) গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলে এবং শেষে সেগুলিকে দখলের মাধ্যমে দেশব্যাপী চূড়ান্ত জয় অর্জন করতে হবে, (ঘ) সেই জয়লাভের উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকশ্রেণীর দৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে, তার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী ছাড়াও পেটি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকেও নিতে হবে, এবং (ঙ) ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতির পরিবর্তে একমাত্র গণকর্মনীতির পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

(৫) ডাঙ্গে বিশ্বাসঘাতকেরা (সি.পি.আই) আর নয়া সংশোধনবাদী (সি.পি.এম.)সহ 'সব ঢং–এর সব ধাচের' সংশোধনবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত নয়া সংশোধনবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের 'চাকর' এবং নিঃসন্দেহে ভারতীয় জনগণের শত্রু।

(৬) নয়া সংশোধনবাদীদের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করার পরিবর্তে যারা এখনও মনে করেন যে অর্ন্তদলীয় লড়াই–এর সুযোগ আছে, তারা সংশোধনবাদ বিরোধীদের মধ্যে নতুন করে মোহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

(৭) বর্তমান পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্তঃ (ক) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তার প্রধান সহযোগী সোভিয়েত নয়া উপনিবেশবাদীদের নেতৃত্বে একটি শিবির এবং (খ) অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক চীন ও মাও ৎসে–তুঙের নেতৃত্বে একটি শিবির।

(৮) বর্তমান যুগ মাও সে–তুঙের বিজয়ের যুগ, যখন সাম্রাজ্যবাদ চূড়ান্ত পতনের মুখে এবং সমাজতন্ত্র বিশ্বব্যাপী চূড়ান্ত বিজেয়ের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

(৯) সেই কারণে এই যুগে মাও সে–তুঙের চিন্তা ধারাকে ভারতের নির্দিষ্ট অবস্হায় প্রয়োগ করে এবং নকশালবাড়ী ধাঁচের সংগ্রাম সংঘটিত করে তাঁর মাধ্যমে একটা সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হবে, কেননা ''বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব জয়ী হতে পারে না।''..................

সারা ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি শেষ পর্যন্ত চারু মজুমদারের 'অবিলম্বে পার্টি গড়ার' মতবাদকেই মেনে নেয় এবং এক বিশেষ সম্মেলনে ২২ এপ্রিল, ১৯৬৯-এ মাও সে-তুঙের চিন্তাধারায় প্রাণিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র প্রতিষ্ঠা হয়। ১ মে, ১৯৬৯-এ কলকাতার ময়দানের জনসভায় কানু সান্যাল আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন।.....

সি.পি.আই (এম-এল) গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চীন পার্টি তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং পিপলস্ ডেইলী পত্রিকায় পার্টির প্রস্তাব ছাপা হয়। পিকিং রেডিও থেকেও পার্টিকে অভিনন্দন জানানো হয়। নাগ রেড্ডি (সিপিএম-এর তীব্র সমালোচক, অথচ সিপি আই (এম-এল)-যোগদানে অস্বীকৃতি ঃ অন্ধ্র গোষ্ঠী প্রমুখ অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোকে অবশ্য স্বীকার বা নিন্দা কিছুই করা হয়নি।

পার্টি গড়ার সময়ে যারা সি, পি, আই (এম এল) এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা সকলেই যে চারুবাবুর সঙ্গে একমত ছিলেন এমন নয়। এদের সতর্ক করে, পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ''সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতদিন আমাদের সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত আছে, ততদিনই তা চলবে। এই সংশোধনবাদ নানা রূপে আবির্ভূত হবে এবং পার্টির নেতৃত্বকে বিকৃত করতে চেষ্টা করবে।'' কিন্তু ১লা মে'র ময়দানের জনসভায় যে অসিত সেন সভাপতিত্ব করেন, তিনি সামান্যকালের মধ্যেই উক্ত পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন। ....

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)'র কর্মসূচী (১৯৭০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিতে গৃহীত) বলা হয়;

''আমাদের দেশ, কৃষক জনসাধারণের দেশ, তারাই আমাদের দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী। এরাই আমাদের দেশে সব থেকে শোষিত হচ্ছেন। এরা বেঁচে রয়েছেন আধপেটা খেয়ে সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যে। ভারতের আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে শতকরা ৮০ ভাগ জমি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে শতকরা ২০ ভাগ ভূস্বামীদের হাতে অর্থাৎ রাজা-রাজড়া, জমিদার আর ধনী কৃষকদের হাতে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের লোক সংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ যে ভূখা কৃষকশ্রেণী, সেই কৃষকশ্রেণীর হাতে মোটেই জমি নেই; নয়তো খুব অল্পই জমি রয়েছে।

ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকরা সারা বছরে যতটুকু ফসল তোলে তার শতকরা ৫০ থেকে ৯০ ভাগই খাজনা হিসেবে জমিদারদের দিয়ে দিতে হয়। এই রক্তচোষা মহাজনী পুঁজি কৃষকদের নিংড়ে নিঃশোষিত করে দিচ্ছে। কৃষককে উচ্ছেদ করাটা আজকের দিনের একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছে। ....

এই প্রেক্ষিতে সি পি আই (এম এল) স্থির করেছিল যে, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ হলে ভারতীয় বিপ্লবের পথ আর ''শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযানই'' গেরিলা যুদ্ধের ভিত্তি ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রধান রূপ। উক্ত পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত সাংগঠনিক রিপোর্টে বলা হয় 'শ্রেণীশত্রু খতম শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতর রূপ এবং গেরিলা-যুদ্ধ জনগণের জনযুদ্ধের সূচনা। এবং একথা উপলব্ধি করতে পারি যে, শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ খতমের লড়াই আমাদের সামনে সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করতে পারে ও জনগণের চেতনাকে উচ্চতর স্তরে তুলতে পারে। ——''

শ্রীকাকুলামে পুলিশী এ্যাকশানঃ
১৪ জন নকশাল নেতা খুন

নকশালবাদীদের তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে মার্চ (১৯৬১) মাসের মধ্যে উক্ত অঞ্চলের (শ্রীকাকুলাম) ৫০০ থেকে ৭০০ বর্গমাইলের সমস্ত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং জঙ্গল ও রাজস্ব বিভাগের পদস্থ কর্মচারীরা এই এলাকায় ঢুকতে অপারগ হয়। পুলিশ দলবদ্ধভাবে ছাড়া ঢুকতে ভয় পেত এবং ভীত জমিদার ও ধনী কৃষকেরা তাদের সঙ্গে কিছুমাত্র সহযোগিতা করছে না।

ইতিপূর্বেই অবশ্য এই অঞ্চলে গণ-আদালতে বিচার করে কয়েকজন জমিদারকে খতম করা হয়েছে; পুলিশসহ এই অঞ্চলে মোট খতমের সংখ্যা তখন গিয়ে দাঁড়িয়েছেল ১৫০ জনে। উক্ত 'মুক্ত এলাকা' তখন শাসন করছিলেন রায়তাঙ্গা (কৃষক) সংগ্রাম সমিতি।

চারুবাবু মার্চের প্রথমে শ্রীকাকুলামে আসেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে এই জেলাই ভারতবর্ষের ইয়েনামে পরিণত হবে এবং এখান থেকেই বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়বে অন্যান্য এলাকায়। কিন্তু শ্রীমজুমদারের এ আশা সফল হবার আগেই পুলিশ অ্যাকশন জোরদার হয় এবং মে মাসে এই বিপ্লবের প্রধান নেতা পঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তি নিহত হন। নভেম্বর ডিসেম্বরে আরো চারটি এনকাউন্টারে নিহত হন দলের প্রখ্যাত ১৩ জন নেতা।

১৯৭০ এর আগস্টের মধ্যেই পার্টির শ্রীকাকুলাম শাখার সম্পাদক তেজেশ্বর রাও ও অন্যান্য ১,৬৪১ জন কর্মী গ্রেপ্তার হন এবং কার্যত পার্টি (সি, পি, আই এম-এল) এক গুরুতর আঘাত পায়। পার্টির পক্ষ থেকেও এ তথ্য স্বীকার করা হয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও পার্টির মতে চারুবাবুর নির্দেশিত পথে কৃষক সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিও শ্রীকাকুলামে অনুসৃত পার্টির পথকে সমর্থন করে লিখেছিলেন, ''শ্রীকাকুলামের মত বিপ্লবী এলাকা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ভারতের বিশাল ভূখন্ডে আবির্ভূত হচ্ছে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)-র নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা নিঃসন্দেহে জয়ের পর জয় অর্জন করবেন।''

১৯৭০-এর ১লা জানুয়ারী সংখ্যা 'দেশব্রতী' পত্রিকায় চারু মজুমদার লেখেন, ''১৯৬৯ সালে ভারতবর্ষের কৃষক-জনতা বড় বড় জয় অর্জন করেছেন, বিরাট বিরাট এলাকায় তাদের সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে, আসাম থেকে পাঞ্জাব, অন্ধ্রে, উড়িষ্যায় — ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে''। তিনি আরো বলেন যে, ''তারা নির্ভর করেছেন চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার উপর, প্রতিটি অত্যাচারের বদলা নেওয়ার জন্য গড়ে তুলেছেন তাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনী। হত্যা করার একচেটিয়া অধিকার তারা কেড়ে নিয়েছেন শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে, প্রতিটি আক্রমণের বদলা নেওয়ার জন্য তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।''

১৯৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরে পশ্চিমবঙ্গে সি, পি আই (এম, এল) জনৈক 'শ্রেণীশত্রু খতমে'র (ধরমপুর গ্রামে) দ্বারা সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। 'দেশব্রতী'র (২৩ এপ্রিল ১৯৭০) রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৬৯-এর মধ্যে ডেবরা-গোপীবল্লভপুর অঞ্চলে তারা ২২ জন শ্রেণীশত্রুকে খতম করেন। ১৯৭০ সালের এপ্রিলের মধ্যে এই খতমের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৬৯-এ। এই ডেবরা ও গোপীবল্লভপুর বিহার ও

উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত এবং এর জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশই আদিবাসী। গোপীবল্লভপুরের মালক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরা 'পাইক বিদ্রোহে' অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং সে ঐতিহ্যের ধারা তারা অদ্যাবধি মানসিকতায় বহন করেন। নকশালবাদী রাজনীতি ও কর্মকান্ডের মধ্যে তারা নিজেদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেয়েছিলেন।

এ অঞ্চলের নেতা সন্তোষ রাণা উক্ত সম্প্রদায়েরই লোক। এখানকার অন্য নেতা ছিলেন অসীম চ্যাটার্জী। ডেবরা অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় কোর্টের উকিল ভবদেব মন্ডল এবং ছাত্রনেতা অশোক মাইতি। ডেবরাতে আন্দোলন শুরু হয় ১ অক্টোবর, ১৯৬৯-এ। ইতিপূর্বে ১৯৬৮ তে স্থানীয় সি, পি এম নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন। কিন্তু চারুবাবুর 'খতমের রাজনীত' তত্ত্ব হিসাবে তাদের কাছে পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত এ আন্দোলন তেমন দানা বাঁধেনি।

সি, পি, আই (এম এল)-এর ডেবরা থানা সংগঠনী কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, ''গোপীবল্লভপুর বহরাগোড়া ডেবরার যৌথ নেতৃত্বে তৈরি হোল ডেবরায় কেন্দ্রীয় গেরিলা দল। আঞ্চলিক গেরিলা দলগুলোও তৈরি হোল। কেন্দ্রীয় পার্টি ও গেরিলা ইউনিটের পরিচালনায় অঞ্চলগুলোর গেরিলা ইউনিটের ভিত শক্ত করা হোল। ১লা অক্টোবর আমরা আমাদের এই লড়াই শুরু করার কর্মসূচী নিলুম। লক্ষ্য, জোতদার খতম করে সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করা।''

ইতিপূর্বে পার্টির 'বাংলা বিহার উড়িষ্যা সীমান্ত এলাকার আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি ' কৃষক জনতার উদ্দেশ্যে যে ইস্তাহার প্রচার করেন, সেখানেই বিপ্লবী কৃষকদের কর্মসূচীতে বিবৃত হয়েছিল।

(১) অত্যাচারী জমিদার জোতদারদের খতম করা হবে এবং তাদের বিশাল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে; (২) জোতদারদের জমির ফসল, ধান বাজেয়াপ্ত করা হবে; (৩) শ্রেণীশত্রুর দালালদের শাস্তি দেওয়া হবে; (৪) শ্রেণীশত্রুর রক্ষাকারী ঘৃণ্য পুলিশ দলকে খতম করা হবে; (৫) জনযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে গেরিলা বাহিনী ও গণমুক্তিফৌজ তৈরি করা হবে।

উক্ত মতাদর্শের ভিত্তিতে ডেবরা অঞ্চলের লড়াই অনেকটা অগ্রসর হয়। জোতদার তাদের দালাল এবং কয়েকজন পুলিশ 'খতম' হয়। যথেষ্ট সংখ্যক কৃষকেরা এই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে। জোতদার শ্রেণীর কয়েকজনের বাড়িতে হানা দিয়ে তাদের বন্দুক কেড়ে নেওয়া হয়। ফসল বাজেয়াপ্ত করে, তা কৃষকদের মধ্যে বিলি করার কাজ চলতে থাকে। জমিদারেরা অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আর ছোট জোতদারেরা কার্যত আত্মসমর্পন করে এবং কৃষকদের সমস্ত সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। ফলে কৃষকের ঋণ মকুব হয়, বন্ধকী জমি সে ফিরে পায় এবং সর্বোপরি তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষেত মজুরেরা পূর্বের তুলনায় প্রায় পাঁচগুণ বেশি মজুরি পেতে থাকে। এবং লক্ষ্যণীয় যে ক্ষেতমজুরেরা এই মজুরি কেবলমাত্র জমিদার ও বড় জোতদারদের কাছ থেকেই আদায় করতো। অন্যপক্ষে যে মধ্যকৃষক তাদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তারা উক্ত বাড়তি মজুরি দেবার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। স্থানীয়ভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও তারা বেঁধে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গোপীবল্লভপুরে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রধানত সাহায্য করেন কলকাতা থেকে আগত একদল ছাত্র-এরাই চারু মজুমদারের তত্ত্ব ও আদর্শের বাহক হিসাবে গ্রামে যান। চারু মজুমদার ছাত্র যুবকদের কাছে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, "ছাত্র যুবক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হচ্ছে, মাওসেতুঙের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করা, আত্মসমর্পণের পথ বর্জন করে শ্রমিক ও কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়া। ভারতবর্ষের শতকরা আশী ভাগ মানুষ আহ্বান জানাচ্ছেন তাদের কাছে। আজ দিন এসেছে এই রাষ্ট্রের ধ্বংস শেষ করার। দিন এসেছে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শোষকশ্রেণীকে খতম করার। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বিপ্লবী আহ্বান জানাচ্ছেন যুবছাত্রদের কাছে, 'দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাও এই শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের কাছে। কারণ তারাই পারে এই লাঞ্ছনা, এই অপমানের অবসান ঘটাতে। অতএব ছাত্র যুবকদের কাছে আজ পার্টির একটিই আবেদন—শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সাথে একাত্ম হও, একাত্ম হও, একাত্ম হও, একাত্ম হও।"

সীমান্ত এলাকার (যেমন গোপীবল্লভপুর) যে ছাত্র যুবকেরা গিয়েছিলেন, তারা চারুবাবুর নির্দেশিত নিম্নোক্ত নীতিগুলো মেনে চলেন:

(১) ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের ঘরে থাকতে চেষ্টা করবে;

(২) ওরা যা খাবে, তাই খাবে; না দিলে খাবে না;

(৩) ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের সাথে কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণ করবে;

(৪) সাধারণত আশেপাশের শহরে, বড় রাস্তায় বা দোকান ইত্যাদিতে আসবে না;

(৫) 'লাল বই' এবং তিনটি লেখা ছাড়া অন্য বই নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই;

(৬) নিরাপত্তার জন্যে কাছে টাকা পয়সা রাখার দরকার নেই। তা না হলে জনগণের ওপর নির্ভরতার বদলে টাকা পয়সার ওপর নির্ভরতা বাড়বে। ....

'শ্বেত সন্ত্রাসের স্থলে লাল সন্ত্রাসের সৃষ্টি'

গেরিলা বাহিনীর হাতে পর পর সামন্ত শোষক ও তাদের দালালেরা খতম হবার ফলে গোপীবল্লভপুর এলাকায় 'শ্বেত সন্ত্রাসের স্থলে লাল সন্ত্রাসের' সৃষ্টি হয়। 'দেশব্রতী'র নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ অনুযায়ী, যুগযুগান্তরের সামন্ত শাসন ভেঙে পড়েছে। সামন্ত শোষকেরা অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে; অনেকে গেরিলা বাহিনীর কাছে নতি স্বীকার ও আত্মসমর্পন করেছে; বাকিরা হয়ে পড়েছে সন্ত্রস্ত ও হতবল। ফলে সেখানে কৃষক জনতার হাতে ক্ষমতা এসেছে এবং তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে এসেছে কতকগুলো প্রশাসনিক দায়িত্ব। বিন্দুপ্রমাণ ও প্রাথমিক স্তরের হলেও এমনকি অস্থায়ী হলেও, এ যে কৃষকরাজ এবং কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপরূপ তাতে সন্দেহ নাই।

শ্রেণীশত্রুরা একথা বুঝতে পেরেছে বলেই, সাধারণ প্রশাসন রাজ্যের পুলিশ এবং জোতদার শ্রেণীর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর উপর নির্ভর না করে সেখানে তারা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের আধা মিলিটারী ফৌজ ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস .... তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই ই. এফ. আর বাহিনী পাঠানোর ফলে গেরিলা বাহিনীর কার্যকলাপ যথেষ্ট

বাধাপ্রাপ্ত হয়; তদুপরি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ সাধিত হবার ফলে তারা ত্রিমুখী আক্রমণের সামনে পড়েন।

এ সময়েই চারু মজুমদার এ অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে ও গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে থেকে অধিক সংখ্যক ক্যাডার সংগ্রহ করে আরো গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন। বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ''তারা (রাজ্য সরকারগুলির সাথে মিলে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার) নির্দেশ দিয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষক বিদ্রোহীদের হত্যা করার। শ্রেণীস্বার্থে উন্মত্ত এই শাসকশ্রেণী আজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সমস্ত দেশের বিপ্লবী জনতার বিরুদ্ধে। চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন প্রতিবিপ্লবী হিংসার একমাত্র জবাব বিপ্লবী হিংসা।

''ওদের প্রত্যেকটি আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের পাল্টা আক্রমণ করতে হবে; তবেই আমরা পারব ওদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে। বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীদের তাই আরও দৃঢ়ভাবে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে চেয়ারম্যানের শিক্ষা, ''বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়।

''ওরা আমাদের হত্যা করতে চায়। হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু। ওদের নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে বিপ্লবী হিংসার পথ গ্রহণ করুন।... আজকের দিনের প্রত্যেকটি বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীর কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)'র আহবান– প্রতিটি আক্রমণের বদলা নিন এবং ঢেউ–এর মত সংগ্রাম ছড়িয়ে দিন। আত্মরক্ষার এই একমাত্র পথ, একমাত্র পরিচিত পথ অন্য কোন পথ নেই। এই পথেই কৃষকের বিপ্লবী সেনাবাহিনী গড়ে উঠবে। কারণ, কখনো ভুলবেন না, ভারতবর্ষে আজ আপনারাই একমাত্র বিপ্লবের শক্তি, প্রগতির শক্তি এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না।'' ......''

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় এবং এর সামান্য কিছুকাল পর থেকে অন্যান্য শহরাঞ্চলে পার্টি নেতৃত্ব থেকে কোনরকম নির্দেশ ব্যতিরেকেই নকশালপন্থীরা তাদের অতিখ্যাত ''সাংস্কৃতিক বিপ্লব'' শুরু করেন এবং গ্রামে পরীক্ষিত 'খতমের অভিযান' এখানেও প্রবর্তিত হোল; এই সঙ্গে হিংসাশ্রয়িতার মাধ্যমে তাঁরা এই 'প্রতিক্রিয়াশীল' শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বাতিল করতে বদ্ধপরিকর হলেন। নেতৃবৃন্দ প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেন নি; তারপর হঠাৎ এই আন্দোলনকে স্বাগত জানালেন এবং এই আন্দোলন থেকেই শুরু হোল সি.পি.আই (এম)–এর সঙ্গে উত্তরোত্তর সংঘর্ষের পর্ব।

চারু মজুমদার বারংবার বলেছিলেন বিপ্লবী কর্মী, ছাত্র এবং যুবকদের গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গেই একাত্ম হবার কথা। শহরের অ্যাকশন কখনোই গ্রামের সংগ্রামের বিকল্প নয়, পরিপূরক মাত্র। অথচ পার্টি কংগ্রেসে চারুবাবু এই অ্যাকশনের বিষয় উল্লেখ করে বললেন, সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই কলকাতার বিপ্লবী যুবকদের লড়াই শুরু হয়েছে। কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীও সংগ্রাম শুরু করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতের অন্যান্য শহরেও শ্রমিকশ্রেণীও বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করবেন; এটা ঘটতে বাধ্য আর এর ফলে শহরের অবস্থায় আসবে আমূল পরিবর্তন।

কলকাতার নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ নানাভাবে বিস্তৃত হয়। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে কারখানায় লাল পতাকা তোলার চেষ্টা চলে এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের একটা ঘটনা ঘটতে থাকে। 'কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরী'তেও এরা লাল পতাকা উড্ডীনে সমর্থ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে মাও-এর রচনা অন্তর্ভুক্ত করার জোরদার দাবী এদের দ্বারা উত্থিত হয়। 'চীন বিরোধী' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বন্ধ করতে হয় এদেরই আন্দোলনের ফলে। এবং যে-মুহূর্ত থেকে বিরোধীদের বাধাদান সংগঠিত হোল, সেই মুহূর্ত থেকেই এরা হিংসার আশ্রয় নিতে শুরু করেন।

শহরে অকস্মাৎ এই অ্যাকশন শুরু হবার কারণ প্রসঙ্গে বহুতর মতবাদ বর্তমান । তবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, গ্রামাঞ্চলে জোরদার পুলিশী অ্যাকশন শুরু হবার ফলে যে ছাত্র-যুবকেরা গ্রামাঞ্চলে গরীব ও ভূমিহীন চাষীর সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়েছিলেন, তারা শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তাদের পক্ষে শহরে অ্যাকশন করা, তুলনামূলকভাবে ছিল সহজ। তদুপরি শহরে পার্টির নির্দিষ্ট কার্যক্রম তাদের বিপ্লবী রোমান্টিকতাকে প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ দেয়নি। তাই অধৈর্য হয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের কার্যক্রম স্থির করে নিলেন এবং গান্ধীর মূর্তি ভাঙার প্রয়াস, আমেরিকান ও সোভিয়েত সাহিত্যের বহ্নিউৎসব ইত্যাদি কার্যাবলীকে তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

এদের প্রাথমিক আক্রমণের লক্ষ্য ছিল আমেরিকা পরিচালিত শিক্ষাসংস্থাগুলি, যা অচিরেই পরিবর্তিত হয়েছিল সমস্ত শিক্ষায়তনের প্রতি আক্রমণে। সাধারণভাবে এরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে অফিসঘর তছনছ করে, জাতীয় নেতাদের ছবি ভেঙেচুরে, পুলিশ আসবার আগেই স্থান ত্যাগ করতেন।........

১৯৭০-৭১ সাল জুড়ে এইসঙ্গে কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলে গান্ধী, বিদ্যাসাগর প্রমুখদের মূর্তি ভাঙা শুরু হয়। অচিরাৎ এ-কাজকে রাজনীতিকভাবে সমর্থন জানান সি.পি.আই (এম.এল)-এর নেতৃবৃন্দ। চারু মজুমদার লেখেন, ''গত কয়েক মাস ধরে কলকাতা ও বাংলাদেশের (ভারতীয় পশ্চিম বঙ্গ) যুবকেরা গান্ধী ও বুর্জোয়া নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারা মূর্তি ভাঙার উৎসব পালন করছেন।.... কিন্তু ছাত্র-যুবকদের এই সংগ্রাম একক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগ্রাম নয়।..... এই সংগ্রাম চলছে কারণ সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব এই বাংলাদেশে (পঃবঙ্গে) এক বাস্তব সত্য হিসাবে বেরিয়ে এসেছে।..... তারা আঘাত হানছেন সেইসব মূর্তির উপর যারা কৃষক জনতার সশস্ত্র বিপ্লবকে চিরদিন শান্ত করতে চেয়ে এসেছে শান্তি ও সংস্কারের বাণী শুনিয়ে। তাই ছাত্র যুবকদের এই সংগ্রাম সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামেরই অঙ্গ।''

চারুবাবুর এই বক্তব্য প্রকাশের কয়েকদিন পরেই (২০ আগষ্ট, ১৯৭০) পার্টির অন্যতম নেতা সরোজ দত্ত একটি প্রবন্ধে মূর্তিভাঙার বিরুদ্ধাচরণকারীদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে লিখলেন, 'মূর্তিভাঙার লড়াই হচ্ছে আসলে দু'মূর্তির লড়াই এবং দুই মূর্তির লড়াই হচ্ছে আসলে দুই রাজনীতির লড়াই, দুই শ্রেণীর লড়াই ।'

এই মূর্তি ভাঙার রাজনীতির প্রসঙ্গে পার্টিতে ভাঙন দেখা দেয়। সেন্ট্রাল কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য সুশীতল রায় চৌধুরী (পূর্ণ ছদ্মনামে) একটি বিবৃতি প্রচার করেন, যার মূখ্য বক্তব্য ছিল, বিপ্লবী রাজনীতির পক্ষে যেহেতু গান্ধী ও গান্ধীবাদ বাধাস্বরূপ, সেহেতু তার

মূর্তিভাঙা চলতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মূর্তিভাঙা অনুচিত; শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্কারের জন্যে অবশ্যই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র নষ্ট করা বা আসবাবপত্র ভাঙা বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরি নষ্ট করা অনুচিত।

চারু মজুমদার উক্ত বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে বলেন যে, তার (সুশীতল) বক্তব্যকে স্বীকার করলে মেনে নিতে হয় যে ভারতীয় বুর্জোয়াদের একাংশ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। এটা পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী। কারণ সেখানে ভারতীয় বুর্জোয়াদের চরিত্র নির্ধারণ করা হয় ' মুৎসুদ্দিরূপে'। যদি গভীর ঘৃণায় ছাত্রেরা আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর করে, তবে সে কাজে কোন বিপ্লবীরই বাধা দেওয়া উচিত না।

স্কুল–কলেজে হানা দেওয়া, মূর্তি ভাঙার মধ্যে দিয়ে, শহরাঞ্চলে পার্টির শ্রেণীশত্রু খতমের কার্যক্রম গৃহীত হয়। পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি ঘোষণা করে যে অন্ধ্র প্রদেশে সি.পি.আই (এম.এল)–র নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের হত্যার বদলা নেওয়ার জন্যেই এখানে পুলিশ, সেনানায়ক, পুঁজিপতি, ও চোরাকারবারীদের খতম করা হবে।

সম্ভবত কলকাতা জেলা কমিটির এই পুলিশ খতমের কার্যক্রমে চারুবাবুর সম্মতি ছিল না। বাংলা–বিহার–উড়িষ্যা সীমান্ত এলাকা কমিটির একটি আন্তঃপার্টি দলিল থেকে জানা যায় যে, চারুবাবু এই পুলিশ হত্যার নিন্দা করেছিলেন। তাঁর মন্তব্য ছিল,''এই পুলিশ খতম শ্রেণীঘৃণা বাড়িয়ে তোলার বদলে কমিয়ে দেবে। মূল কথা হোল শ্রেণীশত্রু খতমের প্রচার বাড়াতে হবে।''

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পার্টির হিসেব অনুযায়ী, জুন মাসের (১৯৭০) মধ্যেই পাঁচ জনকে খতম করা হয়, যার মধ্যে চারজন ছিলেন পুলিশ (কনস্টেবল) বা ইনফরমার; একজন 'সি.পি.আই (এম) পুলিশ এজেন্ট'। সি.পি.আই (এম. এল) কর্মীদের মধ্যে শহারঞ্চলে এই খতম বিষয়ে যতই মতান্তর থাক না কেন, যে মুহূর্তে পার্টি শহর ও গ্রামের অ্যাকশনকে একই কাজের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করলেন, তখন থেকেই কলকাতায় ও জেলা শহরগুলিতে এই 'খতমের কার্যক্রম' বিস্তৃতি লাভ করল।

ফলে ১৯৭০ সালের মধ্যে বেশ কিছু পুলিশের লোক খতম হোল এবং প্রায় ৪০০ জন জখম হলেন। আর যেহেতু ট্রাফিক কনস্টেবলরাই নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে থাকতেন রাস্তায়, সেহেতু তাঁরাই এদের শিকারে পরিণত হলেন; ফলে অচিরাৎ সরকার এই কনস্টেবলদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫০ জন পুলিশের লোক 'খতম' হন, তাদের মধ্যে পদমর্যাদায় কেউই ইনস্পেক্টর–এর উঁচু পদের ছিলেন না। এর ফলে পুলিশ বিভাগেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কলকাতায়, কৃষ্ণনগরে এবং বহরমপুরে পুলিশ কনস্টেবলরা নকশালবাদীদের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা করে। ১৯৭০–এর শেষে সি.পি.আই (এম.এল)–প্রচারিত এক পুস্তিকায় ('পুলিশদের প্রতি') তাদের সরাসরি বলা হয় যে হয় সরকারে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর অথবা নকশালবাদীদের হাতে মৃত্যু বরণের ঝুঁকি নাও। কারণ বিপ্লবীরা পুলিশ কর্মচারীদের খতমের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

পরিণামে স্বভাবতই পুলিশ বিভাগ তৎপর হয়ে ওঠে। এবং সম্ভবত প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মেলনে, নকশাল দমনের সমস্ত ভার পুলিশ বিভাগের

ওপরেই অর্পণ করা হয়। সুতরাং কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পাওয়া যেতে লাগল নকশালদের মৃতদেহ এবং ধরপাকড় ও অত্যাচার চূড়ান্তে উঠল। এসময় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি এক আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করেন। যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অন্ধ্রের নকশালবাদীদের হত্যার নিন্দা মুখর ছিলেন, তারাও পশ্চিমবঙ্গের হত্যাকান্ডে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না।

সিপিএম—এর সঙ্গে নকশালদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু

এদিকে সি.পি.আই (এম.এল)—এর রাজনৈতিক প্রসার লাভে সি.পি.আই (এম)—এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় স্বাভাবিকভাবেই এবং প্রথমোক্ত পার্টির জন্মকালেই উভয় পার্টির মধ্যে যে তিক্ততা জন্ম নেয় , তা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম দিকে দলগতভাবে উভয় পার্টির ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও জ্যোতি বসু নতুন সরকার গঠনে রাজ্যপাল কর্তৃক আহূত হন না; ফলে পার্টির মধ্যে থেকে পুনর্বার পার্লামেন্টারী রাজনীতির পথ গ্রহণ না করার চাপ সৃষ্টি হয়। সি.পি.(এম) নেতৃবৃন্দ এই চাপের কাছে মাথা না নোয়ালেও পার্লামেন্টারী রাজনীতির বিরোধী দলত্যাগী সি.পি.(এম)—দের সংগঠন সি.পি.আই (এম. এল) স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায়। সুতরাং পুনর্বার যাতে সি.পি. (এম)—এ ভাঙন না ঘটে এবং যথারীতি দল ত্যাগ ও সি.পি.আই (এম.এল)—এ যোগদান সম্ভব না হয়, সেকারণেই উক্ত তিক্ত সম্পর্ককে সংঘর্ষের স্তরে নিয়ে যাওয়া রাজনীতিগত ভাবেই তার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এবং এরই অনিবার্য পরিনামে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে খুনের রাজনীতি বিস্তৃত হতে থাকে। এমনকি যে কামাখ্যা বন্দোপাধ্যায় একদা নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন, তিনিও দলত্যাগ করে সি.পি.(এম)—এ যোগ দেওয়ার নকশালবাদীদের হাতে খতম হন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী ১৯৭১—এর মার্চ থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে নকশালবাদীরা ২০ জন সি.পি.(এম) ক্যাডারকে খতম করে এবং বদলে সি.পি.(এম)—ও সমপরিমাণ নকশালকে হত্যা করে। এ সময়ে উভয় দলের মধ্যে মোট ১২৩টি সংঘর্ষ হয়; এর মধ্যে বলা হয়, ৬৮টি বাধায় সি.পি.(এম) কর্মীরা এবং বাকী ৫৫টি নকশালবাদীরা। এর কয়েক মাসের মধ্যে পুলিশ ও সি.পি.(এম)—এর যুগপৎ আক্রমণে সি.পি.(এম.এল)—এর ক্যাডাররা মরতে থাকে অনেক বেশি সংখ্যায়।

মার্চ থেকে ১৯৭১—এর আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৮ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ১,৩৭৫ জন সি.পি. আই (এম.এল)—এর ক্যাডার নিহত হয় এবং সি.পি.(এম) ক্যাডার নিহত হয় ৩৬৮ জন (পি. সুন্দরায়ার হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা মাত্র ২০৬ জন)। বারাসাত (১৯ নভেম্বর ১৯৭০) ডায়মন্ডহারবার (৬ জানুয়ারী ১৯৭১) এবং কোন্নগর (১ জুন ১৯৭১)—এর গণহত্যাকান্ড বিষয় তো সর্বজন বিদিত। কিন্তু বরানগর কাশীপুরের গণহত্যাকান্ড (১২—১৩ আগস্ট ১৯৭১) উক্ত সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে। 'যুগান্তর' পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে (১৫/৮/৭১) লেখেন,

''বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ধরে কাশীপুর বরানগর অঞ্চলে যা হয়েছে তাতে রাজনৈতিক খুনোখুনি একটা নতুন স্তরে উঠল। এখানে —ওখানে

দুয়েকজন খুন জখম নয় , অথবা বারাসাতের ঘটনার মতো গোপনে পাইকারী খুন করে লাশ পাচার করা নয়, একেবারে প্রকাশ্য রাজপথে ধরে ধরে কোতল করা এবং অঞ্চল জুড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তান্ডব চালিয়ে যাওয়া। এটাকে কি বলা হবে? রাজনৈতিক খুনোখুনি? দাঙ্গা? গণহত্যা? পশ্চিমবঙ্গে যেসব বীভৎস কান্ড গত কয়েক মাস যাবৎ চলছে সেগুলির মধ্যেও এমন ঘটনার নজীর পাওয়া যাবে না।''

''ফ্রন্টিয়ার'' (১৮/৯/৭১) তারিখে লেখেন, শুক্র ও শনিবার এই দু'দিনের মধ্যে ১৫০ জনের বেশি তরুণকে খুন করা হয়। অন্যেরা, যারা তরুণ নন, তাদেরকেও মরতে হয়। যাতে কোন ভুল না হয় সেজন্য – যে বড় রাস্তাটা বরানগর থানাকে অন্যান্য অংশের সাথে যুক্ত করেছে, সেই কুঠিঘাট রোডের উপর তখুনি তৈরি করা একটা মঞ্চের গায়ে নিহত লোকদের একটা তালিকা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ঘন্টায় ঘন্টায় সেই তালিকায় নতুন নাম যোগ হতে থাকে। তালিকায় গোটা অঞ্চলের একটি মাত্র অংশই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেবল শুক্রবারেই এই তালিকায় ৬০ টা নাম ওঠে এবং শেষে মৃতের সংখ্যা যখন আর গোনা সম্ভব হচ্ছিল না তখন তালিকাভুক্ত করা বাদ করে দেওয়া হয়।''

এই অব্যাহত খুন-জখমের এবং পুলিশী অত্যাচারের বাধাহীন উন্মত্ততার উল্লাসের মধ্যে নকশালবাদী শহুরে তরুণেরা ক্রমশ ক্ষীণবল এবং হতাশ হয়ে পড়ছিলেন; দলের বহুলাংশ তখন জেলে অথবা নিহত। এই সময়ে ১৯৭১ সালের শেষে চারু মজুমদার শহরে অ্যাকশন বন্ধ করতে নির্দেশ দেনঃ

''এখনই আমরা কলকাতা ও অন্যান্য শহর দখল করতে পারি না এবং তা সম্ভবও নয়। সুতরাং শহরাঞ্চলের পার্টি সদস্যেরা সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত হবেন না।''

কার্যত ১৯৭২ সালের মাধ্যই নকশালবাদী আন্দোলনের ধারা প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। (সংক্ষেপিত)

‘চারু মজুমদারকে ধরিয়ে দিয়েছিল নকশালরাই’

— তপন গায়েন

'চারু মজুমদারকে ধরিয়ে দিয়েছিল নকশালরাই'

— তপন গায়েন

প্রাক্তন নকশাল নেতা কমরেড তপন গায়েনের সঙ্গে 'দৃষ্টিপাত' পত্রিকার পক্ষে কোলকাতার সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ কোরেছিলেন তা' উক্ত পত্রিকার শারদীয় (১৩৯৪) প্রকাশিত হয়। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য আলোচ্য সাক্ষাৎকারটি অত্র পুস্তকে সংকলিত হলো।-সম্পাদক

প্রশ্নঃ আপনার জীবনের প্রায় এক দশক জেলের মধ্যে কেটেছে। স্বাভাবিকভাবে একথা মনে করা খুব অন্যায় হবে না, এই আদর্শের জন্য, নিজের চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসের জন্য আপনাকে ভয়ংকর রকম লড়াই-এর মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। আপনি আপনার কারাজীবনের সেই ভয়ংকর দিনগুলির কথা বলুন। পুলিশের ব্যবহার জেলের ভেতর কিরকম ছিলো? রাজনৈতিক বন্দীদের জেলজীবনের কোন ঘটনা, আপনার নিজের থাকা ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট সত্য উচ্চারণ করুন।

উত্তরঃ ধরা পড়ার পর (খাতায় কলমে ১৯শে জুন ১৯৭১) বেশ কিছুদিন নামে বেনামে বিভিন্ন থানায় ঘুরিয়ে আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হল ১৯৭১-এর ২৬শে জুন। ইতিমধ্যে আমাদের নখে ছুঁচ ফোটানো হয়েছে বহুবার। রেক্টামে রুল ঢোকানো হয়েছে এবং ঝুলিয়ে কচুয়া মারাও হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দুটি। (ক) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মগরাহাটে একটি চৌকিদার খতম (৩০২/১২০ বি) এবং (খ) সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার (৩৫/৩৬ বি.এস.টি.আর.অ্যাক্ট ১৯৩২ সম্ভবতঃ)। পরবর্তীকালে আলিপুর জেল অ্যান্ড আউট-রেজিস্ট কন্সপিরিসি (আলিপুর ষড়যন্ত্র) মামলায়ও অভিযুক্ত হয়েছিলাম। আমি মূলতঃ সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলাম। নাটক, গান, গল্প, কবিতার মধ্য দিয়ে এই আদর্শ প্রচার করতাম। জেল-এর মধ্যেও এগুলো করেছি। জেল-গেট-এ ঢোকার পরই আমাদের জোড়া ফাইল বসতে বলা হল (জোড়া জোড়া উবু হয়ে বসা)। যে এই নির্দেশ দিয়েছিল তার নাম মহাবীর মেট। তার আদেশ এবং ঐ অবস্থায় বসা অপমানজনক মনে হয়েছিল আমার। বসিনি। যথারীতি মহাবীর বেল্ট খুলে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিয়েছিলাম, নকশালবাড়ি লাল সেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটি গলা আমায় সমর্থন জানালো। মহাবীর মেট এবং জেল কনস্টেবল বললো, এরা নকশালপন্থী, বি,ক্লাস, এদের আলাদা কর। এবার আমাদেরকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে তল্লাশির নামে ভীষণ মারধোর করা হয়েছিলো। আমি হাসপাতালে গেলাম।

কদিন থাকার পর আমাকে ৭নং ওয়ার্ডে রাখা হল। সেখানকার মেট ছিল দয়ারাম এবং পাহারা ছিল নারান। সঙ্গে ছিল যেমন চতুর তেমনই অত্যাচারী। তার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে কারুর না কারুর মারপিট হতো। তাই প্রতিমুহূর্তেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হতো আমাদের। বেছে বেছে জঙ্গি বিপ্লবীদের ভাঙা থালা এবং ফুটো বাটি দেওয়া হোত। ছেঁড়া, পুঁজ-রক্ত মাখা কম্বল দেওয়া হোত। ঐ কম্বলে প্রচুর পরিমাণে চিল্লাড় থাকতো। ডিগ্রি তো দিতই না, দুই ডিগ্রির মধ্যের ফাঁকটুকুও দিত না আমাদের। বেছে বেছে রাস্তা আর পায়খানার দরজার মুখে বিছানা পাততে দেওয়া হোত। ফলে ভোররাতে কয়েকশ' বন্দীর মল-মূত্র পায়খানা ভরে গিয়ে গড়িয়ে এসে আমাদের বিছানা-কম্বল ভিজিয়ে দিত। সকালে হাওদায় লাইন দিয়ে চান করবার সময় এক-দুথালার বেশী জল পাওয়া যেত না। কারণ মেট পেটি বা বেল্ট খুলে দাঁড়িয়ে থাকতো। ফলে প্রায় সকলের গায় দগদগে ঘা হয়ে থাকতো সবসময়।

খাবার বলতে ভোরে (দু'তিন দফা ফাইল বসার পর) পোকা চানা/গুমো এবং পোকা চিঁড়ে সঙ্গে ছোট কাঁচের গলির মতো গুড়ের বড়ি। কোন কোন দিন খুব নুন-মুড়ি এক ডাবু। দুপুরে এক ডাবু ভাত সঙ্গে একপিঠ পোড়া একপিঠ কাঁচা ছোট পাতলা রুটি। ভাতের পরিমাণ ছিলো সপ্তাহে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম চালের ভাত। তার মধ্যে ৫/৬ ধাপে (স্টেজে) খাবার চুরিও হতো, নিয়মিত। এক ডাবু তরকারি মানে-এক/আধ পিস খোলাসুদ্ধ কচু,দুই/তিন পিস কুমড়োর টুকরো বা শুধুই খোসা। তরকারি সঙ্গে আলু থাকতো নিশ্চয়ই। কারণ আমরা আলুর খোসা দেখতে পেতাম মাঝে মধ্যে। এমনকি সপ্তাহে একদিন মাছ ও একদিন মাংসও হোত এবং আমরা পেতাম সবার শেষে। আমাদের কমিউনের নির্দেশ ছিল, খাবার যা দেবে, খাবে। বিনা প্রতিবাদে। কারণ আমরা জেলকোর্টের খাবারের বরাদ্দ নিয়ে দৃষ্টিকটু লড়াই করে সময় নষ্ট করতে আসিনি। বরং আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকবে, কিভাবে প্রকৃত কমিউনিস্ট হয়ে গড়ে ওঠা যায়।

বিপ্লবীদের তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল জেলের মধ্যে। যারা গোঁড়া নকশাল তাদেরকে পাঠানো হত ৯নং ওয়ার্ডের নকশাল ফাইলে। যারা 'ওদের কথায়' ভালো হয়ে গেছে, আমাদের কথায় 'আত্মরক্ষা' এসেছে তাদের পাঠানো হত এগারো/বারো নম্বর আত্মরক্ষা সেলে। আর বাকীরা বয়েজ ফাইল, সাত নং (সবচেয়ে বড়ো) এবং পাঁচ নং ফাইলে। ফাইলগুলোর বাইরের পায়খানা ছিল জীবন্ত নরক। মাঝখানে একটা নর্দমা। মাঝে মাঝে ইটের কোমর পর্যন্ত দেওয়াল দেওয়া খোপ। প্রতিদিনই সেগুলো ভরে গিয়ে যেখানে পা দিয়ে প্রাতঃকৃত সারা হয় সেই জায়গা মলমূত্র ও নোংরায় থিকথিকে পোকায় কিলবিল করতো।

এর ওপর প্রতিদিনই আমাদের ওপর চলতো যে কোন ছলছুতোয় শারীরিক নির্যাতন। এমনকি অল্পবয়সী বিপ্লবীদের ওপর দিয়ে দীর্ঘ-মেয়াদীরা মাঝেমধ্যে যৌনক্ষুধাও মেটাতো। এরকম অমানবিক অত্যাচারে সেসময় অনেকেই চলে গিয়েছিলো 'আত্মরক্ষা' সেল-এ। জেলের খাবার ও বিড়ির সুযোগ পেতে অনেক বয়স্ক চোর-ডাকাত ও সাধারণ বন্দীরা স্ব-ইচ্ছায় 'ফালতু' খাটতো এবং যৌন লালসার শিকার হতো ছোকরা হয়ে । অনেক সময় গাঁজার লোভে। জেলের মধ্যে এই গাঁজা লুকিয়ে রাখার অনেক অভিনব কৌশল ছিলো। একটা কৌশল বলি ঃ আলিপুর সেন্ট্রাল জেল-এর ভেতরের দিকে গেটের সামনে একটা সুন্দর ফুলবাগান ছিলো। সেই রাস্তার কাছে একটা মাটির কালো গান্ধী মূর্তি ছিল। ওপরে খড়ের ছাউনি। মেট অথবা জেল পুলিশেরা ঐ গান্ধী মূর্তির তলায় ফুটো করে গাঁজা লুকিয়ে রাখতো। প্রেসিডেন্সি জেলে সাধারণ বন্দী মেয়েদেরও অভিনব কায়দায় ব্যবহার করা হতো তাদের ইচ্ছায়, অনিচ্ছাতেও সে প্রসঙ্গ থাক্।

২৬শে নভেম্বর ১৯৭১-এর একটা ঘটনা বলি। আমাদের ৯নং-এর সহযোদ্ধা ভোম্বলদা একদিন ৭নং-এর রণেশের সঙ্গে (বাড়ি বেহালা) টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে কথা বলছিলো। শুধু এইটুকু অজুহাতেই নির্বিচারে ৮ জনকে স্রেফ লাঠি পেটা করে হত্যা করা হয়েছিল (সরকারি হিসেবে) আমিও স্পটে ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রত্যেককেই যেতে হয়েছিলো হাসপাতালে। হাসপাতালে সার সার শুয়ে আছি। কেউ মারা গেছে, কেউ বেঁচে আছি। সামান্য একটু নড়াচড়া করতে দেখলেই মেরে ঠান্ডা করে দিচ্ছিল 'আশংখা গুনিন' (হাসপাতালের মেট) আর ডাক্তার হাজরার আর্দালি (এই মুহূর্তে নামটা মনে পড়ছে না। যাকে পরে লালবাজার থেকে দেবী রায় অথবা রুনু গুহ এসে পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলো)। ২৬শে

নভেম্বরের সেই পরিকল্পিত হত্যাকান্ডে অনেকেই মারা গিয়েছিল সেদিন। আমরা কয়েকজন যেন আজো কিভাবে বেঁচে আছি।

বাইরে পার্টির তখন আপাতঃ দুর্দিন। শ্রদ্ধেয় নেতাকে হত্যা (চারু মজুমদার) করা হয়েছে। যাদের বেঈমানী সি এম-কে ধরা পড়তে সাহায্য করেছে বলে প্রকাশিত, তাদের দুজন দ্বীপক আর দিলীপকে পেলাম জেলের মধ্যে বন্দী হিসেবে। আমি তখন ১৩নং সেল-এ। এই নিয়ে অনেক বড়ো ঘটনা ঘটতে পারতো। কিন্তু ঘটেনি। ওরা অন্য জায়গায় চলে গেলো শেষ পর্যন্ত। ওই সময় মেদিনীপুর জেলে আমাদের কমরেডদের গণহত্যা করা হয়েছিল। তার নায়ক রোহিণী প্রামাণিক তখন আলিপুর সেন্টাল জেল-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

এর প্রত্যেকটি ঘটনার বদলা নেবার দিন ধার্য করা হয়েছিলো ১লা অক্টোবর ১৯৭৩। জেল পার্টির মধ্যেও তখন দু-লাইনের সংগ্রাম চলছিল। এই সংগ্রামে জি.ও.সি এবং জি.পি.সি'র দু'লাইনের সংগ্রাম নামে পরিচিত ছিলো। কিন্তু ঐ বদলা নেবার ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাকসেসফুল হয়নি। এই মুহূর্তে সবটুকু ডিটেলস-এ বলা সম্ভব নয়। সেই ঘটনায় খাতা-কলমে একজন মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাম-সঞ্জয় বসু রায় (মানিক দাশগুপ্ত)। তাঁর স্ত্রী আজও বেঁচে আছেন (নাম-রাজশ্রী)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের ওপর পুলিশী অত্যাচার ভাষায় বলতে পারবো না। এর পর পি,জি, শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল, লালবাজার, অন্যান্য পুলিশ কাস্টডি, পুলিশ হাসপাতাল হয়ে আমি প্রেসিডেন্সি জেল-এ।

প্রেসিডেন্সি জেলে টি,বি, ওয়ার্ডে ছিলাম। তারপর ১/২২, ২৩/৪৪ সেল-এ এসেছিলাম। সেই সময় অনেকদিন পর আজিজুলদা এবং নিশীথদার (ভট্টাচার্য) সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। প্রথমদিন আমরা একসঙ্গে আটজন ছিলাম। আমি, নিশীথদা, আজিজুলদা, ধীরে (ধীরেন চ্যাটার্জী), ভাই (প্রবীর রায়চৌধুরী), মামা (প্রতীপ ঘোষ), মানু (সতীশ সরকার) এবং অনিল (পাগলা তপন)। এর মধ্যে মামা এবং ভাই হাওড়া জেলে শহীদ হয়েছেন। যেহেতু আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগেই আমাকে হাসপাতাল থেকে সেল-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, স্বাভাবিকভাবে সেদিন রাত্রেই আবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চলে গিয়েছিলাম। যার ফলে নিশীথদা, আজিজুলদার স্টাডি সার্কেলে থাকতে পারিনি।

এরপর আমাকে ট্রান্সফার করা হয়েছিলো দমদম সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে এক একটি সেল-এর রুমে একজন করে বিপ্লবীর সঙ্গে ৩/৪ জন করে চুরি/ডাকাতি কেস-এর আসামী। তারা বলত, তারা কংগ্রেস সাপোর্টার। তারা আমাদের মারধোর করত, খাবার খেয়ে নিত, ডালে পেচ্ছাপ করে দিত। এই সময়ের জেলার ছিলেন প্রভাস রায়, যিনি ১৯৭১-এ দমদম জেলেই পিটিয়ে বন্দী হত্যা করেছিলেন। কুখ্যাত এই জেলার আমার অনেক গল্প/উপন্যাস/কবিতার পান্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। তখন ছিল ১৯৭৫-এর জরুরী অবস্থার দিন। জেল-এ আমাদের 'অনশন সংগ্রাম' করার নিয়ম ছিলো না। পার্টি লাইন ছিল-অনশন হল ভীরুর ক্রন্দন। কিন্তু ঐ কংগ্রেসী সেজে থাকা চোর-গুন্ডা প্রতিরোধ বাহিনীর প্রতিনিয়ত আক্রমণের প্রতিবাদে পার্টির নির্দেশের বিরুদ্ধেও হাঙ্গার স্ট্রাইক করি। দঃ ২৪ পরগণার সি.পি.এম সদস্য বাঁটুল চক্রবর্তী এবং ভীম পরামানিক, ৪নং সেলের আমাদের আশু এমনকি আনন্দমার্গীদের দু'একজনও আমাদের সাহায্য করেছিলো। যার ফলে ওদের প্রতিরোধ বাহিনী ভেঙে যায়। আমরা আবার গান গাইতে শুরু করলাম।

এরপর আবার প্রেসিডেন্সি জেলে আমাকে সিফিলিস, গনোরিয়া রোগগ্রস্ত বন্দীদের সঙ্গে রাখার প্রতিবাদ করেছিলাম আলিপুর জজ কোর্টেই। তার ফলস্বরূপ, সেদিন রাতে আমার

ঘর তল্লাশির নাম করে আমাকে বেদম প্রহার করা হয়েছিল। এরপর থেকেই আমরা আবার জেল থেকে পালাবো প্ল্যান করেছিলাম। এই সময় একদিন আমাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার চোখে জোরালো আলো ফেলে, সম্ভবতঃ আমাকে অন্ধ করে দেবার প্ল্যান করেছিল ওরা। আমি লক-আপ রেজিস্ট করে পি,জি, হাসপাতালে মাথা, ঘাড়, বুক ও চোখ দেখাতে যাই। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। সেরে ওঠবার আর কোন উপায় নেই।

এইসময় বামফ্রন্ট আসে। আর.এস.পি-র এম.এল.এ জয়ন্তদা (বিশ্বাস) ভোটে জিতেছিলেন। জরুরী অবস্থার সময় দমদম জেলে এই জয়ন্তদার সঙ্গে দাবা খেলেছি আমরা। ভেবেছিলাম জয়ন্তদাকে চোখের ব্যাপারে জানবো। জানানো হয়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী এবং কারামন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলাম এ ব্যাপারে। কারাজীবনের আর কত ঘটনা বলবো? বলতে গেলে একটা আস্ত বই হয়ে যাবে। জরুরী অবস্থায় শেষের দিকে বরুণদার (সেনগুপ্ত) সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সফল হয়নি। তবে গৌরিদার (গৌরকিশোর ঘোষ) সঙ্গে কোর্ট অথবা পি জি হাসপাতালে দেখা হতে অনেক ঘটনা জানতে পেরেছিলাম। একমাত্র মহিলা বিপ্লবী বন্দী মলিনা ধকের সঙ্গে আমি এবং আমার এক সহযোদ্ধা পরেশ দুজনে প্রেসিডেন্সির ফিমেল ওয়ার্ডে দেখা করেছিলাম। কারণ মলিনা আমার কবিতা শুনতে চেয়েছিল। আমি সেই 'ফাঁসী সেল'-এর গরাদ ধরে বোন মলিনাকে একটা ছোট্ট কাঁচা কবিতাও উপহার দিয়েছিলাম। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়েছিল তখনকার জেল সুপার ও জেলারের আন্তরিক সহযোগিতায়। এই জেলারই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ১লা অক্টোবর ১৯৭৩ আমাকে জেল হাসপাতালে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জেল জীবনে এই মানসিকতা খুব কম সরকারি কর্মচারী দেখিয়েছে। এই সময় (১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর) আমি ছাড়া পেয়েছিলাম এক সপ্তার জন্য, কারণ আমি কোন বন্ড দিতে রাজী হইনি। তাই আবার জেলে পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু সৌভাগ্য-আবার পুরানো কেসে জজ কোর্টে তোলা হয়। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী পাওয়া যায়নি। এইভাবে দীর্ঘ কারাজীবনের সমাপ্তি হয় ১৯৭৭-এর ২০শে ডিসেম্বর।

প্রশ্নঃ চারু মজুমদারের তৈরী যে আন্দোলন একসময় নতুন প্রজন্মের কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল, সেই আদর্শের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিলো কি?

উত্তরঃ শ্রদ্ধেয় নেতা কম. সি.এম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে কোন ফাঁকি থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম মহৎ আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই। এখানে শুধু দিয়ে যেতে হবে, নেওয়ার কোন ব্যাপার ছিল না। জনগণের সেবায় যেখানে নিজেকে উৎসর্গ করার কথা, সেখানে ফাঁকির জায়গা কোথায়! তাছাড়া আমাদের প্রতিটি বিপ্লবীকে চেয়ারম্যানের তিনটি লেখায় তথা ''যে বোকা বুড়োটা পাহাড় সরিয়েছিল'' অধ্যয়ন করতে হত এবং অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হত। এ ছাড়া মনোযোগ দেবার আটটি ধারা ও তিনটি বৃহৎ শৃংখলা অবশ্যই বাধ্যতামূলক ছিল। তাই আমার মনে হয়, নতুন প্রজন্মের কাছে এ আদর্শ শাশ্বত ও উজ্জ্বল আদর্শ।

প্রশ্নঃ আপাতঃভাবে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, এই গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা। চারুবাবুর এই সিদ্ধান্ত, যা একদিন আপনাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তার মধ্যে কিছু গলদ ছিলো কি? যেমন, অস্ত্রশস্ত্র। শুনেছি, চারুবাবু বলতেন, হাতিয়ার আপনা থেকেই এসে যাবে, বিপ্লব শুরু করে দাও। আপনারাও

রাতারাতি বিপ্লব শুরু করে দিলেন। কিন্তু সেভাবে প্রস্তুতি না তৈরী করে, মাটিকে না জেনে, গ্রামের মানুষদের কাছে গিয়ে তাঁদের একান্ত আত্মীয়ের মতন না হয়ে, যে বিপ্লবের সূচনা করলেন, এতে হঠকারিতা হল না।

উত্তরঃ দেখুন 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা' এই তত্ত্ব চেয়ারম্যান মাও সে তুঙের। চীনের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রয়োগ সফল হয়েছিলো। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষ চীনের-ই মত আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক। যেখানে শিল্পের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি আবার সামন্ততন্ত্রের ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে। যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ বাস করেন গ্রামে। গ্রামেই উৎপাদিত হয় গোটা দেশের খাদ্য সামগ্রী। গ্রাম থেকেই কাঁচা মাল শহরে যায়, শহর সমৃদ্ধ হয়। এবার চিন্তা করুন, গ্রাম জেগে উঠলো। কাঁচা মাল সরবরাহ বন্ধ হোল। গ্রামে রাজনীতি সচেতন এবং সামরিক সচেতন মানুষ তৈরী হল। তখন পারবে কি ঠেকাতে সেই জাগরণকে? কোন শক্তি দিয়ে?

হাতিয়ার মানে শুধু অস্ত্র বোঝায় না। বোঝায় মনোবল, সাহস, শপথ ভালো কাজের জন্য, মাতৃভূমিকে সত্যিকারের শৃংখলমুক্ত করার জন্য, মানুষের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার জন্য। সত্যিকারের সচেতন সৈনিক হতে পারলে তবেই রাইফেল বন্দুকের নিশানা অব্যর্থ হবে। শ্রদ্ধেয় নেতা বোঝাতে চেয়েছিলেন, শত্রু যেখানে সবদিক থেকে শক্তিশালী, সেখানে পিছিয়ে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দু'হাত ওপরে তুলে ধরবো? তার চেয়ে যা হাতের সামনে পাবো, তাই দিয়েই যুদ্ধ শেষ করবো। আমরা দেশ তথা বিপ্লবের জন্য নিবেদিত প্রাণ আর শত্রুদের সৈন্যবাহিনী ভাড়াটে। তিনি বলেছিলেন, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে "জলের মধ্যে মাছ যেমন মিশে থাকে।" এলাকা বাছতে হবে, শত্রু মিত্র ফারাক করতে হবে, শত্রুর দূর্বলতা খুঁজে বের করতে হবে, তারপর আঘাত আনতে হবে।

আমরা রাতারাতি বিপ্লব শুরু করিনি। ১৯৬২ সাল থেকে পরপর আটটি দলিল দেওয়া হয়েছিল। তারও আগে তেলেঙ্গানা এবং তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহাসিক শিক্ষা ছিলো। অতএব রাতারাতির কোন ব্যাপার নয়। আর মাটিকে জানার কথা বলছেন? এই তো আমি, আমি কি গ্রামে থাকিনা? আমি কি মাটির মানুষ নই? আমি তো দক্ষিণ ২৪ পরগণারই ছেলে। আমি সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলাম। অথচ আমার বিরুদ্ধে কেস দিল চৌকিদার খতমের! আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি জানেন, জর্জকোর্টে আমার বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দিলোনা। গ্রামের মানুষেরাই বলেছিলো, কার্ত্তিক মাসের চরম অভাবের দিনে যে চাঁদা তুলে দেয়, যে কন্যাদায়গ্রস্থ বাবাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে, তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবো না। আমি বেকসুর খালাস হয়ে গেলাম। গ্রামের মানুষদের এই ভালোবাসা আর আন্তরিকতার বহু বাস্তব গল্প আমি আপনাকে শোনাতে পারি।

হ্যাঁ, আমারা শেষের দিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম, একথা সত্যি। তার কারণ অন্য। আমাদের পি,আর (সর্বক্ষণের বিপ্লবী) বাছা ভুল হয়েছিলো। শুধু জীবন উৎসর্গ করার মতো বিপ্লবী হলেই হবে না, সত্যিকারের ভালো মানুষ তৈরী করবার কারিগর হতে হব। আমরা সবাই সেরকম কারিগর হয়ে উঠতে পারিনি। তাই শত্রু-মিত্র বাছা ঠিকমতন হয়নি। সেভাবে গ্রাম বাছাইও হয়নি। রণনীতি, রণকৌশল বাস্তবে কেমন হবে, সবাই ঠিক মতন ব্যাখ্যা করে নিতে পারিনি। ৬৭-৬৯-এর যুক্তফ্রন্টের অথবা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধীতা করতে প্রচুর কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন, স্বার্থাণ্বেষী যুবক হিরোইজমের ফল উপভোগ করতে

ঢুকে পড়েছিলো। আমাদের অভিজ্ঞতার অভাবেই এসব ঘটেছিলো। পরবর্তীকালে তার মাশুল আমাদের দিতে হয়েছে। যার ফলে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ছিলাম।

প্রশ্নঃ 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন—এ ঠিক একইভাবে নাটকীয়তায় উম্মাদের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। যেমন, সেখানে অস্ত্র থাকে সেখানে গুলি থাকে না। তাই অস্ত্রাগার লুন্ঠন করে অস্ত্রগুলি পাওয়া গিয়েছিলো সেসময়, বারুদ পাওয়া যায়নি। এর ফলে বিপ্লবের আন্দোলনে স্বপ্ন দেখে কিছু জলজ্যান্ত মানুষ মারা গিয়েছিলো, স্রেফ নাটকীয়তার জন্য। আমাদের মনে হয় চারুবাবুর ব্যর্থতা এখানেই। তাই নয় কি?

উত্তরঃ 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন' আর 'জনগণতান্ত্রিক তথা নয়াগণতান্ত্রিক সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব' এক কথা নয়। আমরা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী, সন্ত্রাসবাদে নয়। তবে চট্টগ্রাম আন্দোলন নি শ্চয়ই বিপ্লবী আন্দোলন। এই আন্দোলনে নাটকীয়তা যদি থাকে, উম্মাদনা যদি থাকে, তার মধ্যে নাটক ছিলো না, দেশমুক্তির আদর্শ ছিল। এখানে উম্মাদের লক্ষণ খুঁচিয়ে বের করা ভুল। উম্মাদনা যা ছিল জাগরণের, শৃখল ভাঙবার। বিপ্লবীদের কাছে তখন বৈজ্ঞানিকভাবে মার্কসবাদ—লেনিনবাদ এসেছিলো কি?

দেখুন, চট্টগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী অনন্ত সিংহের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে আলিপুর সেন্টাল জেল হাসপাতালে, কোর্টে যাবার পথে জেল গেটে এবং দুবার কনডেম সেল, মিসডেম সেলে। তাঁর অভিজ্ঞতায় আমি নিজের কানেই শুনেছি দালনের ব্যর্থতা আর আমাদের ব্যর্থতা এক নয়। আর তাছাড়া আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি। তাই 'ব্যর্থ' কথাটিতে আমার আপত্তি। আমরা থমকে গেছি মাত্র। 'সংগ্রাম' 'সমালোচনা', 'রূপান্তর'। আমরা 'সমালোচনায়' তৎপর, তাই আমার বক্তব্য—'রূপান্তর' ঘটবে।

'জনযুদ্ধের' তত্ত্ব অন্য জিনিস। জনগণকে যুদ্ধে সামিল করানো। ইতিহাসের তার প্রামাণ আছে। লেনিনগ্রাদের যুদ্ধের কথা মনে করুন। চীনের জাপ—বিরোধী জনযুদ্ধের কথা মনে করুন। তাই আমাদের যুদ্ধে ছিল দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধের তত্ত্ব। রাশিয়ার বিপ্লব ১৯০৫ সালে শেষ হয়ে যায়নি। 'খারখবের' ইতিহাস, চীনের ৪ঠা মে'র আন্দোলনের কথা ভাবুন। তাই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন আর আমাদের নকশালবাড়ী তথা আমাদের কৃষি বিপ্লব এক নয়।

প্রশ্নঃ আমরা, বিশেষভাবে আমি, স্বচক্ষে দেখেছি, প্রেসিডেন্সি কলেজের বা কলকাতার নামী কলেজের ছেলেমেয়েরা যারা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রত নিয়েছিলো তারা কিন্তু মাত্র দু'এক বছর গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। তার কারণ, আমি দেখেছি, তাদের ধরিয়ে দিয়েছিলো ঐ গ্রামেরই মানুষজন। পুলিশ বিপ্লবীদের ধরতো পায়ের চুলকানি দেখে। খড়ের গাদায় শুয়ে থাকলে বা অন্যরকম অস্বাভাবিক কোন আঁস্তাকুড়ে যাতে পায়ে ঘা হয়। বড়লোকের ছেলেমেয়েদের ঐ পা দেখলেই, ঐ ঘা দেখলেই পুলিশ ধরে নিত। তার কারণ, অনেক প্রস্তুতি দরকার একটা বিপ্লবের জন্য। প্রচলিত ধ্যান—ধারণা পাল্টাবার জন্য মানুষকে তৈরী করা হয়নি। সুতরাং এখানেও চারুবাবুর ব্যর্থতা নয় কি?

উত্তরঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ বা অন্য ভালো কলেজের শুধু নামকরা বড়লোকের ভালো ছেলেরা এসেছে তা যেমন সত্যি, আমাদের মত সাধারণ ছাত্র যুবরাও এগিয়ে এসেছিলো সেদিন। সব জায়গা থেকেই ছাত্ররা এসেছিল। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, নতুন জাগরণে, ধ্বংস ও সৃষ্টিতে, এগিয়ে থাকা অংশ আগে অংশগ্রহণ করে। এর কারণ, ভালো ছাত্রদের

আই.কিউ.অনেক উচ্চমানের। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী সুভাষ থেকে শুরু করে জগজীবন রামের মত ছাত্ররাও প্রেসিডেন্সিতেই পড়তো। আর দু'এক বছরে একাত্ম হওয়া যাবে না কেন? যেখানে যুদ্ধের মধ্যে বাস করছি! দু'এক মাসেও সম্ভব। ঐ যে আগে বললাম, ঠিকমতন পি.আর প্রফেশনাল রিভালিউশনারি হয়ে সবাই গড়ে উঠতে পারেনি। নিজেদের কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হবে, সেই অভিজ্ঞতা আমাদের ছিলো না।

গ্রামের চাষী, গরীব হলেই সবাই নকশাল আন্দোলন সমর্থন করবে, এটা ভাবা ভুল। তাই শত্রু শিবিরের লোক, আপাতঃ শান্ত-নিরীহ লোকের বাস গ্রাম-শহর সবখানেই আছে। পায়ের চুলকানি দেখে পুলিশ ধরতো, এটা কাকতলীয় ব্যাপার বা সাময়িক ঘটনা। ঠিক-ই, এটা বিপ্লবীদের ত্রুটি। ''চার ভালোর এক ভালো, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভালো''-এই নীতি থেকে গেলেই চুলকানি হতেই পারে। ঠিক-ই, বিপ্লবীদের জীবন কষ্টের-জীবন। একদিনেই বিপ্লবী তথা কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব নয়। ''একটা ভালো কাজ করা সম্ভব কিন্তু সারাজীবন ধরে বারবার ভালো কাজ করা খুবই কঠিন।''

সত্যি কথা, বড়লোকের ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারেনি। এটা সি.এম.এর একার ব্যর্থতা নয়। এটা পার্টির অভিজ্ঞতার অভাব, সেটা আগেই বলেছি। ঠিকমত সংগঠক গড়ে ওঠেনি সবাই। আমরা জনগণ থেকে সরে যাচ্ছি কেন, পার্টির ভুল কোথায়, এই নিয়ে ''দুই লাইন'' ছিলো। সি,এম, এবং সুশীতলদার (রায়চৌধুরী) ''দুই লাইন''। এই দুই লাইন সম্পূর্ণ সফল হলে আজকের ইতিহাস অন্যরকম হতো।

প্রশ্নঃ 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরবো' বা 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' এসব শ্লোগান নিশ্চয়ই ঠিক হয়নি? কারণ আপনাদেরই কোন প্রতিনিধিকে মাও সে তুঙ বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের চেয়ারম্যান হবো কেন? তোমরা তোমাদের চেয়ারম্যান করবে।' আপনার কি মনে হয় না, নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার এটিও একটি প্রধান কারণ?

উত্তরঃ আমার যদ্দুর জানা আছে, আমাদের এখান থেকে কানুদা (সান্যাল) এবং সৌরেনদা (বসু) চীনে গিয়েছিলেন। সৌরেনদাকে সম্ভবতঃ কম কাঙ সেঙ এগারোটি পয়েন্টে সমালোচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'চীনের চেয়ারম্যান' প্রসঙ্গটি ছিলো-এটা সৌরেনদার দাবী। ওঁদের বক্তব্য ছিলো (সৌরেনদার কথা অনুযায়ী), এক দেশের চেয়ারম্যান আর এক দেশের চেয়ারম্যান হলে ভারতীয় শ্রমিকদের জাতীয় সেন্টিমেন্টে ঘা লাগবে। আমরা সৌরেনদা তথা চীনের ঐ সমালোচনা মেনে নিইনি। তার কারণ, আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। সেই চেতনায় শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয় সেন্টিমেন্ট বলে কিছু থাকে কিনা, আমরা জানিনা।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারা আমরা নিয়েছি। মাও সে তুঙ-এর আদর্শ আমাদের আদর্শ হিসেবে নিয়েছি। সেখানে মাও সে তুঙকে আমাদের নেতা বলতে কি এসে যায়? (যেখানে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে গেছে।) মাও সে তুঙ যেখানে বিশ্ববিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সেই অবস্থায় কম, সি,এম 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চীনের পথ আমাদের পথ' এই আন্তর্জাতিক শ্লোগানে বিশ্ববিপ্লবের ক্ষেত্রে মাও সে তুঙকে আরও বেশী করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন (যেখানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা বর্তমান)।

প্রশ্নঃ আমি দেখেছি, আমার বন্ধুরাই, একদিন যারা আন্দোলন করেছিল এসবেরেই প্রতিবাদে, আজ তারা সরকারের কাছে বিপ্লবের নামে বিগত বিপ্লবী হয়ে কিছু টাকা–পয়সা পায়। এটা তারা নেয় কেন? কোন্ অজুহাতে? তারা কি খুশি থাকে বিগত বিপ্লবী হয়ে?

উত্তরঃ এই সমালোচনা ভালো। এই সমালোচনা গ্রহণ করা উচিত। কে কিভাবে টাকা পাচ্ছে, আমি জানিনা। আমার পেনশনের টাকা পাওয়ার ঘটনা আমি বলতে পারি। আমি প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলাম (শেষ পর্বে), তখন শুনতে পাচ্ছিলাম, আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আমি শারীরিকভাবে হ্যান্ডিক্যাপড হয়ে গেছি। জেল থেকে আমি দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন কারামন্ত্রী) এবং মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলাম, আমাদের মত যাদের হ্যান্ডিক্যাপড করে দেওয়া হয়েছে তাদের মাশুল কে দেবে? সেসময় আমার চিঠির উত্তর পাইনি। পরে জেল থেকে বেরিয়ে আমি একটি আবেদন করি (স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক পেনশন–রাজ্য সরকার–এর স্কীম)।

১৯৬৭ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে আমি পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেছি, জেল–এ গিয়েছি। সেজন্য পেনশন পাই। এটা কারুর দয়ার দান নয়। যদিও এই ব্যাপারে সত্যপ্রসন্ন দত্ত (সঞ্জয়দা প্রতিষ্ঠিত 'পূর্বাশা' পত্রিকার প্রকাশক ও সঞ্জয়দার মৃত্যুর পর সম্পাদক) আমাকে ভীষণ সহযোগিতা করেছিলেন। অবশ্য আমার পার্টি যদি নির্দেশ দেয়, এটা নেওয়া ভুল, তাহলে আমি পেনশন নেওয়া বন্ধ করে দেব।

প্রশ্নঃ এই বিপ্লব কতটা সার্থক এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই বিপ্লবের সার্থকতা কী?

উত্তরঃ একজন বিপ্লবীও নিশ্চয়ই একজন কবি। স্তালিন কবিতা লিখেছিলেন। চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ অনেক কবিতা লিখেছেন। মাও সে তুঙ–এর দ্বন্দ্বতত্ত্বের ওপর একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন বলছি, শুনুনঃ 'প্রকৃতি যদি ভাবপ্রবণ হতো/তাহলে যৌবন পদার্পণ করতো বয়েসে/কিন্তু মানুষের দুনিয়ায়/সাগর রূপান্তরিত হয় গোলাপজামের বাগানে।' আমি মনে করি না আমাদের এই আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধ চলাকালীন, আমি মনে করি, আঘাতের জন্য সাময়িক থমকে গেছে মাত্র। আমি আজও সেই যুদ্ধের মধ্যেই আছি–আমার অন্ততঃ এরকম মনে হয়। আমি মনে করি ফাইট সেলফ (বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম) এবং সেলফ ফাইট (সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা) –এর মধ্যে আমি সংগ্রাম করে বেঁচে আছি। 'বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আমি আজও ফেরার/·····/সময় হয়নি ঘরে আজও ফেরার।'–আমি আমার কবিতার দুটি লাইন আপনাকে বললাম, ওর মধ্যেই আপনার প্রশ্নের উত্তর আছে। নতুন প্রজন্মের কাছে আরও একটি দৃষ্টান্ত আছে। আমার আদর্শ, নিকোলাই অস্ত্রভস্কির লেখা 'ইস্পাত' উপন্যাসের নায়ক পাভেল করচাগিন। তাঁর আর্দশ, ''········ এই জীবন সে পায় মাত্র একটিবার। তাই এমনভাবে তাকে বাঁচতে হবে, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে সে বলতে পারে, আমার সমগ্র জীবন, আমার সমগ্র শক্তি আমি ব্যয় করেছি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আদর্শের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রামে·····'' [সংক্ষেপিত। 'দৃষ্টিপাত' শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৪]

কমরেড চারু মজুমদারের
জীবনের শেষ অধ্যায়
—সৌরিন বসু

কমরেড চারু মজুমদারের জীবনের শেষ অধ্যায়

—সৌরিন বসু

১৯৬৯ সালের ২৭শে এপ্রিলের কো-আর্ডিনেশান কমিটির অধিবেশনে সিপি আই (এম-এল)-এর সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হল ১১ জন সদস্য নিয়ে ঃ-

১. চারু মজুমদার

২. সুশীতল রায় চৌধুরী

৩. শিব কুমার মিশ্র

৪. সরোজ দত্ত

৫. সত্য নারায়ণ সিংহ

৬. আর পি আশরাফ

৭. কানু সান্যাল

৮. পঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তি

৯. চৌধুরী তেজেশ্বর রাও

১০. এল আপ্পু

১১. সৌরেন বসু

২৭শে এপ্রিলই পার্টি গঠরেন তারিখ হলেও সিদ্ধান্ত করা হল যে, এ বছর ২২শে এপ্রিল লেনিনের শতবর্ষ পূর্তি বলে ২২শে এপ্রিলকেই পার্টি গঠনের দিন বলে ঘোষণা করা হবে।

সি, পি, আই (এম-এল)-এর রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হল যে ভারতীয় জনগণের উপর চেপে বসে আছে যে চার পর্বত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েৎ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় মুৎসুদ্দি ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজি ও সামন্তবাদ তাকে উৎখাত করে তবেই মুক্তি আসতে পারে। আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে সাম্রাজ্যবাদের সাথে জনগণের, মৃৎসুদ্দি ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর ও সামন্তবাদের সাথে কৃষক জনগণের মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে সামন্তবাদের সাথে কৃষক জনগণের দ্বন্দ্বই প্রধান দ্বন্দ্ব। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতীয় বিপ্লবের বর্তমান স্তর যার মূল উপাদান হচ্ছে কৃষি বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদের পরিপূর্ণ পতন ও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের এই যুগে, মাও সে-তুঙ-এর এই যুগে সংসদীয় ও প্রকাশ্য গণসংগঠনে দেউলিয়াপনা প্রকাশিত হওয়ায় জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম ও জনযুদ্ধই সংগ্রামের একমাত্র ধরন হিসাবে প্রতিপন্ন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মূল রূপ গেরিলা যুদ্ধ।

ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে বরাবরই বিশ্বাসঘাতক বুর্জোয়া নেতৃত্বের সাথে সর্বহারা সাধারণ কর্মীদের দুই লাইনের লড়াই চলে এসেছে, কিন্তু সব সময়েই নেতৃত্ব নানা চাতুরী দিয়ে আন্তঃপার্টি সংগ্রামকে ধামাচাপা দিয়েছে। সপ্তম কংগ্রেসেও (সি-পি এম গঠিত হওয়া) তেমনই হয়েছে। তাই আজ নতুন ধরনের পার্টি গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সাংগঠনিক প্রস্তাবে পার্টিকে গোপন সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা, গ্রাম ভিত্তিক পার্টি, সদস্য সংগ্রহের মানদন্ড, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে কঠোর শৃংখলা আরোপের পূর্বে

পার্টি সদস্যের গণতান্ত্রিক অধিকার বোধ জাগরুক করা, সঠিক কর্মী নীতি , যাতে 'রোগ সারিয়ে রোগীকে মুক্ত করার' পদ্ধতি নেওয়া যায় প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা হল এবং ঘোষণা করা হল যে এটি একটি সশস্ত্র সংগ্রামের পার্টি (A party of armed struggle)।

১লা মে মনুমেন্ট ময়দানে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে পার্টি গঠনের ঘোষণা করলেন কানু সান্যাল। চারু মজুমদার বলেছিলেন– ''কানু যেন লিখিত বক্তব্য পড়ে দেয়।'' বক্তৃতা লিখলেন অন্যে এবং কানু তা আর আগে না পড়ে বল্লেন– ''যা আছে ঠিক আছে।'' ....

মিটিং–এর জন্য দক্ষিণ কলকাতা থেকে যখন একটি বড় মিছিল আসছিল তখন সিপি (এম)–এর একটি মিছিলও পাশাপাশি চলতে থাকে (সি পি এম–এরও প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা ছিল) এবং দুই মিছিলে সংঘর্ষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ময়দানের চতুর্দিক ঘিরে রাখা পুলিশ বাহিনী মিটিং স্থলে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। বেশ একটি গন্ডগোলের সূচনা হল। সকলকে ফিরিয়ে এনে মিটিং স্থলে জড়ো করার ক্ষেত্রে কলকাতা কো–অর্ডিনেশান কমিটির ভলান্টিয়াররা খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভলান্টিয়ারদের নেতা হিসাবে শ্যামল নন্দী, মলিন রায়, শিবাংশু মুখার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য। মিটিং শেষে কানু সান্যালদের প্রায় টেনে হিঁচড়ে ভলান্টিয়াররা ভীড় পার করে নিয়ে গেল মলিন রায়ের বাড়ী, দক্ষিণ কলকাতায়। সকালে সরোজ দত্ত এসে কানুকে বল্লেন– ' এই যে কানু, তোমার এই বিবৃতিটা দেশব্রতীতে ছাপা হচ্ছে।' বিবৃতিটির শিরোনামা ছিল 'হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেবো।' বিবৃতিতে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সভার আহত শ্রোতাদের কানু সান্যালের রাত্রেই দেখতে যাওয়ার এক কাল্পনিক কাহিনী ছিল। দেশ ব্রতীতে এই বিবৃতি বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই কলকাতার অনেক দেয়ালে লেখা হল 'হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেবো।'

জনসভায় কি হল না হল তা নিয়ে চারু মজুমদারের মাথা ব্যথা নেই। দক্ষিণ কলকাতার বাড়ীতে দুপুরে বালিশে হেলান দিয়ে ভাবতে থাকেন। চারিপাশে সকলে কথা বলে চলেছে। সরোজ দত্ত বলতে থাকেন–''যুবা, মস্তান সকলেরই মনে দারুণ উত্তেজনা যে পার্টি গঠিত হয়েছে। একটা লাইন ওদের দিয়ে দিলাম কানুর নাম করে যে 'হিংসার বদলে হিংসা।' সি পি (এম) কে টাইট দেওয়ার একটা কায়দা হল।'' চারুর কানে কিছু যা না– তিনি দেখছেন মুক্তির দিকে এগুবার পথে বড় একটা কাজ হল পার্টি গঠন, ভাবলেন আর কি কি এখনই করতে হবে! হঠাৎ স্বভাবসিদ্ধ তুড়ি মেরে বললেন– ''চীনা সাহেবদের কাছে পার্টি গঠনের সমর্থণ যত তাড়াতাড়ি হয় নিতে হবে।'' খবর ও অনুরোধ পাঠাবার ব্যবস্থা তখনই করে ফেললেন চারু। মে মাসে খবর পেলেও পিকিং রেডিওতে সি পি আই (এম–এল)–এর প্রতি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন ঘোষণা করতে দেড় মাস সময় লাগল– '৬৯ সালে ২রা জুলাই এই ঘোষণা করা হয়েছিল। চারু ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে চীনের পার্টির সমর্থন বিপ্লবীদের, বিশেষ করে তরুণদের সি পি আই (এম–এল)–এর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট করবে।

চারুর হিসাবে খুব ভুল ছিল না। আগষ্টের মধ্যেই মেদিনীপুরের ডেবরা–গোপীবল্লভপুর ও বিহারের বহড়াগোড়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সহযোগিতায় যে কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল সেখান থেকে অসীম চ্যাটার্জী, সন্তোষ রাণা, ভবদেব মন্ডল, গুণধর মুর্মু প্রমুখদের নেতৃত্বে সি পি আই (এম–এল)–এ যোগদানের কথা ঘোষণা করলেন। পার্টির গঠনে

সংগ্রামের সব এলাকাতেই পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু হল। চারু মজুমদারেরও নিজের বক্তব্য ও ধারণা জোর দিয়ে বলার সুযোগ সৃষ্টি হল।

তরুণের যে বিদ্রোহ '৬৬ সাল থেকেই বার বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল '৬৮ সাল থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র বিক্ষোভ দিয়ে তা চীনের পথ ও মাও সে-তুঙ চিন্তাধারার খাতে বইতে শুরু করেছিল। এর পিছনে মধ্যবিত্ত জীবনের উপর অর্থনৈতিক চাপের প্রশ্নে যতই থাক, প্রাধানত ছিল ভাবের রাজ্যে আলাড়ন, বিশ্বমানবের মুক্তির প্রশ্নে যুক্তিবাদের এক প্রাবল্য। গতানুগতিক ছাত্র সংগঠনের বাইরে বেরিয়ে বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টা, '৬৯ সালে এসে এরূপ সংগঠনের জন্য কর্মসূচী ও সাংগঠনিক প্রস্তাব তৈরী হল। কিন্তু ছাত্র-যুব তরুণের দলের এতে সন্তুষ্টি নেই। সে তো চায় পুরানো চিন্তা ভাবনা সংগঠন সব চুরমার করে মহামানবের মুক্তির এক তীর্থক্ষেত্র গড়ে তুলতে। তার পথ সে জানে না, তার রূপও তার কাছে স্পষ্ট নেই। নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম তরুণদের ভাবরাজ্যে যে নাড়া দিয়েছিল তাতেই তাদের অগ্রণী অংশের মধ্যে মানব মুক্তির পথের দিশা কৃষকের সংগ্রামের মধ্যে পেতে লেগেছিল- মেদিনীপুরের সংগ্রাম, পরবর্তী কালে ২৪ পরগণা , নদীয়া ও বিশেষভাবে বীরভূমের কৃষক গেরিলা সংগ্রামে তরুণরাই এগিয়ে এলো। সি পি আই (এম-এল) গঠনের ঘোষণা তরুণদের সামনে যেন বিপ্লবের আলো স্তম্ভ বা লাইট হাউসের উপর থেকে ঘোষণা করলো-

'বন্দরের কাল হল শেষ
যাত্রা করো যাত্রীদল।'

চারু মজুমদারের নামে অভিযোগ ও তীব্র সমালোচনা হয়েছে যে ছাত্র-যুবকদের কলকাতার সমাবেশে প্রথমে অভিনন্দন জানালেন পরে সমাবেশের সময়ে উত্তর বাংলার প্রতিনিধিদের মারফৎ যে চিঠি দিলেন তাতে ছাত্র- যুবদের নিজস্ব সংগঠন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কৃষকের সাথে একাত্ম হতে গ্রামে যেতে বল্লেন। প্রশ্ন হল ঐ পরিস্থিতিতে তরুণদের নিজ সংগঠনের মধ্যে থেকে গতানুগতিক পদ্ধতি নিতে বললে তারা চারু মজুমদারের কথা শুনতো কি? -চারু ছাড়া আর সবাই তো ঐ উপদেশই দিয়েছিলেন, তঁদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি কেন?

'ছাত্র যুবদের প্রতি আহবানে' চারু যখন লিখলেন ''একজন মানুষের জীবনে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সই হচ্ছে সেই সময় যখন সে সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে উদ্দীপ্ত হতে পারে, হতে পারে সব থেকে সাহসী আর আদর্শের প্রতি সবচেয়ে নিষ্ঠাবান। আর এই বয়সেই ভারতের ছাত্র যুবকদের বাধ্য করা হয় এক জনবিরোধী শিক্ষার অনুশীলন করতে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে। আমি সত্যিই আনন্দিত হবো যদি দেখি যে তোমরা বিপ্লবী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ো পরীক্ষা পাশের নিষ্ফল কাজে শক্তিক্ষয় না করে''-তখন তাঁর কোথা থেকে বিশ্বাস এসেছিল যে অন্যান্য বিজ্ঞজনদের কথায় কান না দিয়ে তাঁর কথাতেই স্কুল কলেজ ছেড়ে ছেলেমেয়েরা বিপ্লবে ঝাপিয়ে পড়বে?

'৬৯ সালের মে মাস থেকে মুশাহারী, শ্রীকাকুলামে ছোট গেরিলা দলের শ্রেণী শত্রু খতম অভিযান, গণ আদালত গঠন ব্যাপক আকারে শুরু হয়ে গেল। সেপ্টেম্বরের 'লিবারেশান' কাগজে সত্যনারাণ সিং লিখলেন- ''মুশাহারীর গেরিলারা দেড় মাসের মধ্যেই তিনটি আক্রমণ পরিচালনা করে পাঁচ জন শ্রেণীশত্রুকে খতম করেছে, পনর জনকে ঘায়েল

করেছে, জমির বন্ধকী কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার। আমাদের কাজগুলি থেকে কি উপলব্ধি হচ্ছে? এক শ্রেণীশত্রুকে খতম করার সাথে সাথেই রাষ্ট্র অর্থাৎ পুলিশ এসে হাজির হচ্ছে, আমাদের লড়াই তখন রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তির সাথে গেরিলাযুদ্ধে চলে যাচ্ছে। আমাদের বর্তমান বিপ্লবী সংগ্রামের লক্ষ্য মুশাহারী অঞ্চলে শক্ত বিপ্লবী মুক্ত ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা। একাজ এক এক করে এক একটি জমিদারকে আক্রমণ ও তাকে খতম না করে কি সম্ভব?'' কৃষক সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে বিহারের কয়েকটি অঞ্চলে ভূমি বন্টন কমিটি, গণ আদালত গঠিত হয়েছিল, গ্রাম রক্ষীদল গড়ে উঠেছিল গেরিলা দলের সহযোগিতায় ও নেতৃত্বে।

২৭ মে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির মিটিং সেরে ফেরার পথে সোমপেটা ষ্টেশনে তাঁকে নিতে আসা ছয়জন সঙ্গীসহ পঞ্চাদ্রী কৃষ্ণমূর্তি গ্রেপ্তার হলেন এবং পুলিশ জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে এদের সকলকেই গুলি করে মারল। তখন থেকেই বড় বড় দলের বদলে ১০ থেকে ১৫ জনের গেরিলা দল গঠন করা হল এবং আগষ্ট মাসের মধ্যেই হত্যাকারী ঐ পুলিশদের ক্যাম্প আক্রমণ করে একটি পুলিশকে খতম করে গেরিলাদল সরে পড়লো। শ্রীকাকুলামের সমতল অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়লো গেরিলা কার্যকলাপ। অন্ধ্রের কৃষ্ণা ও গুন্টুর জেলাতেও সংগ্রাম ছড়ালো– তেলেঙ্গানার লড়াই–এর সময়কার লুকিয়ে রাখা এক রাইফেল এসে গেল গেরিলাদের হাতে।

উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় সি.পি. (এম)–এর এক সময়কার রাজ্য কমিটির সদস্য ডি.বি.এম পট্টনায়ক ও তরুণ উকিল নাগভূষণ পট্টনায়কের নেতৃত্বে খতম অভিযান আরম্ভ হল।

'৬৯ সালে শেষ ভাগ থেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে এবং রাজ্যগতভাবে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, ও পাঞ্জাব সরকার বিভিন্ন এলাকাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করলো ও কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ক্যাম্প বসাতে শুরু করল। নকশাল আন্দোলনকে রাষ্ট্রশক্তি তাদের পক্ষে বিপদের কারণ বলে স্বীকার করতে বাধ্য হল।

আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া , নলবাড়ী, শিলচরে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সংগ্রাম ছড়ালো ত্রিপুরায়।

ওদিকে পাঞ্জাবে ও জম্মু কাশ্মীর সীমান্ত অঞ্চলে গেরিলা এ্যাকশান শুরু হল– পাঞ্জাবের ঘটনা ইংলন্ডের পাঞ্জাবী শ্রমিকদের এতই উৎসাহিত করল যে তাঁরা গুরুমুখী ভাষায় নকশাল আন্দোলনের সমর্থনে পত্রিকাও প্রকাশ করতে লেগেছিলেন।

'৬৯ সালের শেষের দিকে সংগ্রামের যে জোয়ার চলছিল তার একটি গুণগত পরিবর্তিত চরিত্র ছিল নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রামের চেয়ে। গেরিলা দলই এই ক্ষেত্রে ছিল সংগ্রামের প্রধান উদ্যোক্তা, এবং এই সময়ে জমিদারদের ও গ্রামীণ শোষকদের উপর আক্রমণ শোষকশ্রেণীকেও যেমন আতঙ্কিত করে দিয়েছিল জনগণের দরদ, সহানুভূতিও তেমন ব্যাপক হয়েছিল– এমনকি জমিদারবাড়ীতে সাধারণ ডাকাতিতেও মানুষের উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছিল, সংবাদ ছড়িয়ে পড়ছিল চারিদিকে– তা সে অন্ধ্রে, পশ্চিম বাংলাতেই হোক আর বিহার, উড়িষ্যা, আসামেই হোক। শাসক শ্রেণীর গেল গেল রব– অন্ধ্র, উড়িষ্যা, বিহারে সরকারী প্রশাসনের পুলিশী নৃশংসতা ইতিপূর্বের ভারতের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদীদের উপর বৃটিশের নৃশংসতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীকে দিল্লীর লোকসভায় শোষক

শ্রেণীর প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়ে বলতে হয়েছিল–'অতি শীঘ্রই নকশালদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

নকশালদের গ্রেপ্তার করার সাথে সাথে হত্যা করা ছাড়া ওরা আর কোন পথ দেখছিল না। ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে, কমিউনিষ্ট আন্দোলনেও বৃটিশ থেকে শুরু করে দেশীয় শাসকরা ইতিপূর্বে কেবল জেলে পুরে ও জেলে মর্যাদা দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছে যে' এঁরা যতই সংগ্রাম করুক, আইনের শাসনের (Rule of law) বাইরে যাবে না!' নকশাল আন্দোলনকে তারা বুঝেছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম। এর থেকেও বোঝা যায় যে 'মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি' আওয়াজ মুখে নিয়ে যে মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম তার পিছনে সত্য সত্যই ছিল প্রকৃত এক বিপ্লবী প্রেরণা। এখানেই ছিল আন্দোলন ও সংগ্রামে পুরানো গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ, এইটেই ছিল নকশাল আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

পার্টি গঠনের পর থেকেই শুরু হয়েছে চারু মজুমদারের অত্মগোপনকারী জীবন। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় থাকা শরীরের উপর বেশ চাপ দিচ্ছে। বুকে ব্যথা হঠাৎ হয়, ডাক্তার কাউকে হাতের কাছে থাকতে হয়। ই, সি, জি, মাঝে মাঝেই করতে হয়। বেদনা, জ্বালা–যন্ত্রণা উপশমের জন্য পেথিডিন ইনজেকশানের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। চারু বলেন–''একটু ভালো থাকবো, আবার অস্থুস্থ হবো, এই ভাবেই চলবে!'' শরীর নিয়ে তত ভাবনা নেই–ভাবনা যত বিপ্লব নিয়ে।

চারু বুঝছেন সংগ্রামে নতুন ধরন আসছে,পরিস্থিতিটা বুঝতে তেমন ভুল করছেন বলে মনে করছেন না. একটা অহঙ্কারও গড়ে উঠেছে মনের মধ্যে, কারণ পার্টি গঠনের আগে বা গঠনের পরে যাঁরা সরে গেলেন– ''তাঁরা পুরানো সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে, প্রকাশ্য গণসংগঠন গুলিরই প্রসার ঘটিয়ে চলতে চাইলেন সেই পুরানো পদ্ধতিতেই ধাপে ধাপে এগুনোর চিন্তাধারায়–তফাৎ কেবল তত্ত্বটা হচ্ছে বিপ্লবের। তাঁরা যত সৎই হোন, নিষ্ঠাবান হোন, অভ্যুত্থান যে সব কিছু নতুন ভাবে করতে চায় সেইটিই তাঁরা বুঝলেন না।"বস্তুগতভাবে এবং চিন্তাগত উভয় দিকেই নতুন ভাবে ভাবতে হবে এটি চারুই সব থেকে আগে অনুভব করছিলেন, এইটিই ছিল অহঙ্কারেরও কারণ– আর নেতৃস্থানীয় অন্য সকলের কাছে এইটেই ছিল চারুর প্রতি গভীর আনুগত্যের কারণ।

'সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত কর'

'৭০ সাল শুরু হতেই চারু আহ্বান জানালেন "সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত কর।" শ্রীকাকুলামের সংবাদ শুনে লিখলেন–" ''একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়েছে।" গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামী এলাকা নিয়ে কিছুদিন যাবতই তাঁর কতকগুলি চিন্তা ভাবনা মনের মধ্যে গড়ে উঠছিল। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কাছাকাছি যাঁদের পাচ্ছিলেন, তাঁদের কারও সাথেই আলাপ আলোচনা করে চারুর তৃপ্তি হচ্ছিল না, 'কেউই যেন অবস্থাটা বুঝতে পারছেনা' বলে মনে হচ্ছিল তাঁর–আবার নিজের ভাবনার বস্তুগত দিকেই যেমন সমস্যার প্রতি অভিজ্ঞতালব্ধ যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় ছিল তেমনই। আবার কল্পনার একপেশে ধারায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে দ্রুত মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তবের সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

পার্টি কর্মীদের কাছে নির্দেশ হিসেবে চারু লিখলেন– ''গেরিলা দলগুলির সংগঠন সম্বন্ধে চরম গোপনীয়তা রাখতে হবে, এ্যাকশান সম্বন্ধেও অনুরূপ গোপনীয়তা রাখতে হবে, কিন্তু শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক প্রচারের কাজটি আগে করা চাই এবং সেটি পার্টি কমিটির দায়িত্ব। শ্রেণী শত্রু বাছই–এর কাজে অনেক সময়েই ভুল হয়– ঘৃণিত শ্রেণী শত্রুর বিষয়ে যথাসাধ্য গোপন খোঁজ খবর করাটাকে অবশ্য দায়িত্ব করে নিতে হবে। একটি শ্রেণী শত্রু খতম হলে, বাইরের লোক হিসেবে খোঁজ নিতে হবে গ্রামবাসীদের মনের প্রতিকিয়া কি? জমিদার, মহাজন গ্রাম ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করলেই গ্রামে কর্তৃত্বের ফাঁকা (Vacuum) অবস্থার সৃষ্টি– এই সময়ে একদিকে যেমন ফসল কেটে নেওয়া, জমি দখলের আওয়াজ দিতে হবে তেমনি গ্রাম জীবন সুষ্ঠু ভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপ্রবী গ্রাম কমিটি গঠন করতে হবে সকলেরই মত নিয়ে। বিপ্রবী গ্রাম কমিটি, শিক্ষার প্রসার কমিটি, নারী অধিকার কমিটি প্রভৃতি গঠন করবে। এই ভাবেই আঞ্চলিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়গুলি শুরু হবে। যত ব্যাপক ভাবে গেরিলা এ্যাকশানকে ছড়িয়ে দিতে পারবো, শত্রুর ঘেরাও থেকে বাইরে বেরুবারও তত সুযোগ হবে, শত্রুর শক্তিকে ছড়িয়েও দেওয়া যাবে।" এই নির্দেশের বেশ কিছু বাস্তব রূপ দেখা গেছে ডেবরা, গোপীবল্লভপুরে, মুশাহারী, চম্পারণে, আসাম, ত্রিপুরায়, অন্ধ্র প্রদেশ, কেরালায় ও পাঞ্জাবে।

'সত্তরের দশক হবে মুক্তির দশক' এই আওয়াজে নতুন করে গণজাগরণ হল তরুণদের মধ্যে –বেশীর ভাগ পশ্চিম বাংলায়–তারপর অন্ধ্র, পাঞ্জাব ও কেরালায়। তবে পশ্চিম বাংলাতেই এর রূপ ছিল সর্বাত্মক। কলকাতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের বাসস্থান সমস্যা, নদীয়ার উদ্বস্তু সমস্যা বা মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি হিসেব নিকেষকে ছাপিয়ে বালিগঞ্জের বড় বাড়ীর ছেলে–মেয়ে আর বস্তিবাসী সব জায়গা থেকে তরুণের দল রাস্তায় নেমে এসেছিল। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 'মনীষীদের' প্রতি চূড়ান্ত অবজ্ঞা। স্কুলের বাড়ী,আসবাবপত্র মায় গাড়ীতে আগুন লাগল, 'মণীষী' নেতৃবৃন্দের মর্মর মূর্তিগুলি ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল। দেয়ালে দেয়ালে লাল, কালো, নীল কালিতে 'গ্রামে গ্রামে জোতদার জমিদার খতম চলছে, চলবে,' 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' 'চীনের পথ আমাদের পথ' বড় বড় অক্ষরে লেখা চলতে লাগল। লেখা হল ''বন্দুকের নল–এর মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা জন্ম গ্রহণ করে।''

চারুর বিপ্লবী ভাবনার শুরু থেকেই তরুণদের বিপ্লবের কাজে লাগাবার চিন্তা। ......

সত্তর দশকের তরুণের বিদ্রোহে চারু মজুমদার বললেন—''এই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মৃৎসুদ্দি পুঁজিবাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলিকে ধ্বংস না করে নতুন বিপ্লবী শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায় না। কিন্তু এই সংগ্রাম প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির পুরো উপরিতলাটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার কাজ করবে না, যেমন হচ্ছে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে। আর আমাদের বিপ্লবের এই স্তরে তা করা সম্ভবও না। এই সংগ্রাম চলছে কারণ সশস্ত্র কৃষি বিপ্রব আজ বাংলায় আবির্ভূত হয়েছে বাস্তবরূপে। সমাজের ভিৎটা নড়বড়ে হয়ে উঠেছে কৃষকের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের আঘাতে। তাই এই সমাজের উপরের কাঠামোতেও ধাক্কা লাগছে, ভাঙন ধরছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই। কৃষি বিপ্লবের স্বার্থেই আজ ছাত্র–যুবারা অশান্ত হয়ে উঠেছে, সেই জন্যই তারা সেসব লোকের মূর্তিগুলিকে আঘাত করছে যাঁরা সব সময়েই কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামকে শান্তি আর সংস্কারের বাণী

সংগ্রামের পথ থেকে টেনে আনতে চেয়েছেন। তরুণদের এই সংগ্রাম কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামেরই অংশ।''

তরুণদের বিদ্রোহ একটি নির্দিষ্ট ছক নিতে শুরু করেছিল পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই। তাহল –

(ক) শহরে আলোড়ন সৃষ্টি করে, গ্রামের সংগ্রামের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রামে কৃষকের সাথে একাত্ম হতে চলে যাওয়া;

(খ) ঔপনিবেশিক শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আঘাত দেওয়া,

(গ) রাষ্ট্রের স্তম্ভ পুলিশের উপর হামলা করে 'লাল সন্ত্রাস' সৃষ্টি করা,

(ঘ) রাইফেল ছিনিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করা।

চারু মজুমদারেরই অতি প্রিয় কবিতা 'মৃত্যুঞ্জয়'–এর ধারা বেয়েই যেন এই তরুণেরা 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়' বলে নিঃশেষে প্রাণবলি দিয়েও নিজেদের কাজ করে যেতে লাগল — ইতিহাস হয়তো তার ইচ্ছামত হচ্ছিল না, তবুও সে তো ইতিহাস সৃষ্টি করতে লাগল? কেউ বলেছেন 'লুমপেন সর্বহারার কাজ ছিল এসব!' কেউ ওয়াগান ব্রেকারদের কেবল দেখলেন। কারা ছিল এই তরুণের দলে?

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের ছেলে, শ্রদ্ধেয় বাম রাজনৈতিক নেতার একমাত্র পুত্র, ধনীর দুলালী মেয়ে, ইনজিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি, মেডিক্যাল কলেজের কৃতি ছাত্ররা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল মস্তান নামে পরিচিত পাড়ার ত্রাস তরুণ. 'লুমপেন' বলে চিহ্নিত বস্তিবাসী মজুরের ছেলে এবং অনেক ওয়াগান ব্রেকারের সাথে–সংগ্রামের সময় কেউ কারও চেয়ে কম যায়নি — সংগ্রামের সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বেলা ভূমিতে সবার সমস্ত রকম পারিবারিক পরিচয়ের বাইরে সবারই একটিই মাত্র পরিচয়ে পরিচিতি হয়েছিল — বিপ্লবী তরুণ। সব কিছুতো ভেঙে ফেলেছিল এরা! শোষক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ন্যায় নীতিবোধ, ধর্মীয় কুসংস্কার, জাত পাতের বাঁদরামী সব কিছু। রেডবুক হাতে নিয়ে বিয়ে করেছে, মতে–মনে মেলেনি, আবার ছেড়েছেও পরস্পরকে; কেউ কেউ তো কোনরকম অনুষ্ঠান না করেই স্বামী–স্ত্রী হিসাবে বসবাস করেছে, চাষীর সাথে মদ, হাঁড়িয়া খেয়ে আনন্দ করেছে আবার চাষীর সাথে মাঠে সব রকমের কাজ করেছে, কোন কোন শহরের ছেলে রাজবংশী কিংবা ওঁরাও চাষীর মেয়েকে বিয়েও করেছে।

'৭০ সালের মার্চ–এপ্রিলের সি পি আই (এম–এল)–এর পক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পার্টি শাখা একটি প্রচারপত্র বিলি করল —''প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করেছে তা মূলত ঔপনিবেশিক। বৃটিশ সরকার এই ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল দালাল ও দাস মনোবৃত্তির মানুষ তৈরী করার জন্য, তারপর এলো '৪৭ সালের তামাসা। যে জাতি আপোষের দ্বারা 'স্বাধীন' হল, বিশ্বাসঘাতকদের পরিচালনায় সে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা কখনই জঙ্গী এবং উপনিবেশবাদ বিরোধী হতে পারে না। মুৎসুদ্দি শাসকেরা ঐ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চালু রেখেছে — যা ছাত্র আর যুবাদের জীবিকা নির্বাহের তাগিদের পেশার আফিমে আচ্ছন্ন করে রেখেছে আর শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা করতে শিখিয়েছে। কখনও কখনও এই আগল ভেঙে শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে পথে নেমে এসেছে সে কথা ঠিক, কিন্তু তা সংস্কারবাদী সংগঠন ও কলেজ ইউনিয়নের চোরাবালিতে বিলীন হয়ে গেছে। নকশালবাড়ীর সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে সি

পি আই (এম–এল)–এর নেতৃত্বে কৃষকের মুক্তি সংগ্রাম যখন সমাজের মূলে আঘাত করল, সমাজের উপরের কাঠামো নড়ে উঠতে লাগলো, তখন বিপ্লবী ছাত্র ও যুবাদের কাছে পথের দিশা পরিষ্কার হয়ে গেল।''

সি পি আই (এম–এল) থেকে বাঙলায় একটি প্রচারপত্রে বলা হল — ''স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে শাসকশ্রেণী নির্লজ্জভাবে অতীতের সব 'মণীষী'দের 'বাণীগুলি' দেওয়ালে, ট্রামে, বাসে, রেডিও, পত্র–পত্রিকা ও সিনেমার মাধ্যমে প্রচার করছে, জনগণের মনে বিপ্লব ও সি পি আই (এম–এল) সম্বন্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। কাজেই আমাদের পক্ষ থেকে ঐ সব মণীষীদের বিরুদ্ধে শ্রেণী ঘৃণা জাগিয়ে তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিপ্লবী ছাত্র–যুবকেরা যাঁদের মূর্তি ভাঙছে সেই সব জাতীয় নেতারা হয়তো মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এঁদের কিছু কিছু ভূমিকা ছিল নিশ্চয়ই, অবশ্যই বিদেশী শক্তির স্বার্থের পক্ষে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রশ্নটি তাঁর শ্রেণীভিত্তিকে বাদ দিয়ে বিচারের সময় এখনও আসেনি।''

চারু মজুমদার ছাত্রযুবাদের একথাও বললেন যে — ''নিজস্ব গন্ডির মধ্যে থেকে কেবল শহরে এ্যাকশন করলেই হবে না — শ্রমিক এবং গরীব ও মধ্য কৃষকের সাথে একাত্ম হতে না পারলে তোমাদের বিপ্লবী চরিত্র বজায় রাখা কঠিন হবে।''

চারু মজুমদারের বক্তব্যকে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে প্রাঞ্জল করে সরোজ দত্ত লিখলেন — ''গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলেছে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পাশাপাশি। বিপ্লবে কিছু অতিশয় হবেই। অতীতকে ভুলে যাও, অতীতের কবিদেরও ভুলে যাও। নতুন কবিতা আবৃত্তি কর চারু মজুমদারের শ্লোগানগুলি দিয়ে, তা হচ্ছে 'আজ অনুশোচনার দিন নয়, আজ আগুনের মত জ্বলে ওঠার দিন, 'সত্তরের দশকে মুক্তির দশকে পরিণত করো।'' ....

সংগ্রামী এলাকার রাজ্য সরকারগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকার '৭০ সালের গোড়া থেকেই 'নকশাল বিপদকে' রোখার জন্য সশস্ত্র পুলিশ, সি, আর, পি, এমনকি সেনাবাহিনীকেও ব্যবহার করতে শুরু করল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর স্পষ্টই ঘোষণা করল, ''চম্বল উপত্যকার ডাকাতদের চেয়েও গুরুতর বিপদের এই নকশাল আন্দোলন।'' মার্চে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেই রাষ্ট্রপতির শাসন মেদিনীপুরে ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স, এবং সি, আর, পি, সম্মিলিত অভিযান শুরু করল। শ্রীকাকুলামে এক একটি তালুককে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করে সি, আর, পি, আক্রমণ শুরু করল। নকশালপন্থীদের গ্রেপ্তার করেই গুলি করে মারার এক নতুন সাফাই চালু করা হল 'এনকাউন্টার'। ওরা নাকি পুলিশের সাথে লড়াই করার সময়ে মরেছে। শহর কলকাতায় এভাবে গ্রেপ্তার করা ছেলেদের গাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ করে গাড়ী দাঁড় করিয়ে পুলিশ অফিসার বলতো — ''ছেড়ে দিলাম, যা পালা!'' যেই কেউ ছাড়া পেয়ে দৌড়তে থাকতো, ওমনি তাকে পিছন থেকে গুলি করে মেরে কাগজে খবর দেওয়া হত পুলিশের সাথে 'এনকাউন্টার'।

'বাঁধন যত শক্ত হয়' ততই বাঁধন ছেড়ার জোয়ার চলতে থাকে — নতুন নতুন গান সৃষ্টি হয়। নাটকের দল জনবহুল রাস্তায় বিপ্লবী পথ–নাটিকা দেখিয়েই সরে পড়ে। কবিতায় আসে নতুন ধার।

এই সবগুলিই চারুকে অত্যাচার ও শত্রুর আক্রমণ একেবারে ভুলিয়ে দেয়। বিপ্লবের পথ নিয়ে স্বপ্ন বিলাস আসে চারুর মনে।

চুয়ান্ন বছর বয়সেও দেখায় কত বৃদ্ধ। গাল ভেঙে গেছে, তাই চোখ দুটো আরো বড় দেখায়। খাটের উপর কিল মেরে বলেন ''৭২-এই রিপাবলিক ডিক্লেয়ার করব, সমস্ত ভারত জ্বলে উঠলো বলে—তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অসংকোচে ঘোষণা করে দিতে পারেন যে ''আমি বলছি ৭৫ সালে ভারত মুক্ত হয়ে যাবে।''

সুরোজ দত্ত আরও এগিয়ে দেন স্বপ্ন কল্পনাকে। ''ক্যাডারদের মধ্যে ক্রমাগত উৎসাহ জাগাতে সব সময়ে বিজয়ের খবর জানিয়ে যেতে হবে। ঘটনাকে বাড়িয়ে বলতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীলরা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেদের কাজ বাড়িয়ে বলে, ''ইয়েলো জারনালিজম'' দিয়ে আমাদের কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে কুৎসিৎ করে দেখায়, আমরাও তার জবাবে ''রেড জারনালিজম''-এ সত্যকার সংগ্রামের কথাও একটু বাড়িয়ে বললে দোষ নেই। সরোজ দত্ত ঘোষণা করে দেন 'আমাদের লিবারেশান রেডিও শীঘ্রই হবে।' বলেন 'পিপলস্ লিবারেশান আর্মি মার্চ করবে, লঙ মার্চ, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।'.......................

'১৯৪৭-এ আসে আপোষের দ্বারা মেকি স্বাধীনতা'

১৯৭০ সালের ১৫ই ও ১৬ই মে কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকায় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বাংলা, বিহার, ইউ পি, আসাম, ত্রিপুরা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীর থেকে প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে যোগ দেন। সুশীতল রায় চৌধুরী, সরোজ দত্ত ও কানু স্যান্যালকে নিয়ে গঠিত হয় সভাপতিমন্ডলী।

পার্টির খসড়া কর্মসূচীতে বলা হয় যে-'মুৎসুদ্দি চরিত্রের ভারতীয় বুর্জোয়ারা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে আপোষ ও আত্মসমর্পনের পথে নিয়েছিল। মহান অক্টোবর বিপ্লব মার্কসবাদ লেনিনবাদের আদর্শ ভারতে পৌঁছোলেও নানা সুযোগ সত্বেও ভারতের কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারেনি, জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁরা অপারগ হয়েছে; গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম করতে অস্বীকার করে। এঁরা বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের সাথে পার্টিকে একাত্ম করতে অস্বীকার করেছে, চীনা বিপ্লব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব কংগ্রেস নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তি করেছে। পার্টির নেতারা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের দালাল। তা সত্বেও পার্টির সাধারণ সদস্য অনেক সংগ্রাম করেছে। অনেক শ্রেণী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে অনেক প্রাণপাত করেছে।'

'যুদ্ধোত্তর যুগের অভূতপূর্ব বিপ্লবী অভ্যুথান দেখে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেস, লীগ ও সি পি আই -এর দালালদের কাজে লাগায় বিপ্লবী সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগ করে ১৯৪৭-এ আসে আপোষের দ্বারা মেকি স্বাধীনতা। মেকি স্বাধীনতার এই সময়ে মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও বড় জমিদার গোষ্ঠীর শাসক শ্রেণী তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েৎ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের কাছে আমাদের দেশ বিকিয়ে দিয়েছে। স্বভাবতই ভারত আজ ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া উপনিবেশে পরিণত হয়েছে।'

খসড়ায় ভারতের মুক্তির পথে প্রধান বাধা হিসাবে বলা হয় 'চারটি বিশাল পর্বত অর্থাৎ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ।'................

চারু মজুমদারের বক্তৃতার পর বিশ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। বিহারের কৃষক নেতা রাজকিশোর সিং জমিদারের গুন্ডার হাতে নিহত হওয়ায় তাঁর নামের পরিবর্তে সত্যনারায়ণ সিং প্রস্তাব করেন অসীম চ্যাটার্জীর নাম। এছাড়া আর সব নাম সহ কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির উপস্থিত করা তালিকাই গৃহীত হয়। এই তালিকায় ছিল ঃ-

১) চারু মজুমদার (পঃবঙ্গ)

২) সুশীতল রায় চৌধুরী (ঐ)

৩) সরোজ দত্ত (ঐ)

৪) কানু সান্যাল (ঐ)

৫) সৌরেন বোস (ঐ)

৬) সুনীতি ঘোষ (ঐ)

৭) অসীম চ্যাটার্জী (ঐ)

৮) সত্যনারায়ণ সিং (বিহার)

৯) গুরুবক্স (ঐ)

১০। শিব কুমার মিশ্র (উত্তর প্রদেশ)

১১) মহিন্দর সিং (ঐ)

১২) ভেম্পটাপু সত্যনারায়ণ (অন্ধ্র)

১৩) আদিবাটলা কৈলাশন (ঐ)

১৪) নাগভূষণ পট্টনায়ক (ঐ)

১৫) আম্পালা শুরি (ঐ)

১৬) এল আপ্পু (তামিলনাড়ু)

১৭) কোদনরাম (ঐ)

১৮) আম্বাডি (কেরালা)

১৯) আর পি আশরাফ (জম্মু-কাশ্মীর)

২০) সোহল (পাঞ্জাব)

চারু মজুমদারকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

পরদিন সকালে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসে পলিটব্যুরো গঠন করার জন্য। অন্ধ্রের প্রতিনিধিরা আগের দিনই চলে গিয়েছিলেন, পাঞ্জাবের প্রতিনিধি কংগ্রেসে উপস্থিতই হতে পারেন নি। সুশীতল রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই বৈঠকে কজনকে নিয়ে অর্থাৎ পাঁচজন না সাতজন এই নিয়ে বিতর্ক ওঠে। তখন সত্যনারায়ণ সিং চারু মজুমদারকে অনুরোধ করেন পলিটব্যুরো সদস্যের সংখ্যা ও নামের প্রস্তাব দিতে। শিবকুমার মিশ্র, সত্যনারায়ণ সিং ও সৌরেন বোস। সরোজ দত্ত এতে তীব্র আপত্তি করেন এবং বলেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই পলিটব্যুরো সক্ষম হবে না। অন্যান্যরা পাঁচ জনের

কমিটিই চেয়েছিলেন এবং সত্য নারায়ণ সিং ও সৌরেন বোস নিজ নিজ নাম প্রত্যাহার করে নিতে চান সরোজ দত্ত ও অন্য একজনের নামের পরিবর্তে।

অবশেষে এই নিয়ে বিতর্কের অবসান করে চারুমজুমদার প্রস্তাব করেন যে, যে এগারোজন নিয়ে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি ছিল তাদের নিয়েই পলিটব্যুরো হোক। তার মধ্যে অন্ধ্রের পঞ্চাদ্রি নিহত ও তেজেশ্বর জেলে থাকায় ঠিক হল যে অন্ধ্রের কমরেডদের কাছে তাঁদের প্রতিনিধির নাম চেয়ে পাঠানো হবে। কারণ নাগভূষণ ও আপ্পালা শুরি উভয়ের নামেই ভেম্পটাপূ এবং মল্লিকার্জুনের আপত্তি তাঁরা আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। পলিটব্যুরো গঠিত হল–চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধূরী, সরোজ দত্ত, কানু স্যান্যাল, সৌরেন বোস, সত্যনারায়ণ সিং, শিবকুমার মিশ্র, আর,পি,স্রফ,এল, আপ্পু এবং অন্ধ্রের দুইজন।.........

'৭০—এর মার্চঃ পিকিং রেডিও থেকে নকশালদের প্রচারনা বন্ধ

'৭০ সালের জুন মাস থেকেই শ্রীকাকুলামে শুরু হয়েছিল প্রচন্ড সরকারী আক্রমণ। উত্তর প্রদেশ স্পেশাল আর্মড পুলিশ ও সি,আর,পি,সম্মিলিত অভিযান চালিয়ে শ'য়ে শ'য়ে গিরিজনদের গ্রেপ্তার করল। পুরো আদিবাসী অঞ্চল ভাগ ভাগ করে ভিয়েৎনামের মত 'ষ্ট্যাটেজিক হ্যামলেট' গড়ে তুললো, সেখান থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন কাজের জন্য লাল, হলুদ কার্ড দেওয়া হতে লাগল এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য করা হতে লাগল। পুলিশ ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসার জনা বিপ্লবীরা সমতলে খতম অভিযান শুরু করল। কিন্তু গণভিত্তিহীন সম্পূর্ণ অপরিচিত অঞ্চলে নির্বিচার খতম অভিযান অতি দ্রুত তাদের পুলিশের নজরে এনে ফেললো। জুলাই মাসের মধ্যেই ভেম্পটাপূ , সত্যনারায়ণ, কৈলাশন, মল্লিকার্জুন, সুব্বারাও পানীগ্রাহী, পঞ্চাদ্রি, নির্মলা, আঙ্কাম্মা, ডাঃ ভাস্কর রাও প্রভৃতি প্রায় সব কজন প্রথম সারির পুরুষ ও মহিলা নেতৃবৃন্দ পুলিশের হাতে প্রাণ দিলেন, আর গ্রেপ্তারের প্রায় সীমা সংখ্যাই রইল না।

সরকারী আক্রমণের তীব্রতা দেখে চারু মজুমদারের মনে হতে লেগেছে 'এ হচ্ছে পরাজিত শত্রুর মরণ কামড়।' মাও সে–তুঙ–এর' ৭০–এর ২০শে মে বিবৃতি তাঁর কাছে নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী। মাও–এর বিবৃতিতে 'বিপ্লবই আজকের দুনিয়ার প্রধান ঝোঁক' এবং 'একটি পার্টি যত ছোটই হোক তা জনগণকে অস্ত্র হাতে নিতে উদ্বুদ্ধ করলে জয়লাভ করবেই' বলে যে বক্তব্য ছিল, চারু তাকেই একমাত্র রাজনৈতিক লাইন মনে করে বলতে লাগলেন–''ভারতের সর্বত্রই বিপ্লবী পরিস্থিতি এমন যে তিনজনের একটি গেরিলা দল খতম অভিযান চালিয়ে যে কোন স্থানেই মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করতে পারে।''এই সময়ে খুব জোর দিয়েই তিনি বলতে লাগলেন যে গণসংগঠন ও গণআন্দোলনের কোন প্রয়োজন নেই–সেগুলির একটি কাজ তো জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য, জনগণ তো প্রস্তুত হয়েই আছে। ''এখানে টুক, ওখানে টাক এইভাবে গেরিলাদের খতম অভিযান চালিয়ে যাও, দেখবে ঢেউ এর পরে ঢেউ এর মত জনসমুদ্র (human sea) শত্রুকে গ্রাস করে ফেলবে।''

এক দুশ্চিন্তা চারুর মনে। '৭০ সালের মার্চ মাস থেকে পিকিং রেডিও থেকে চারু মজুমদারের রচনা এবং নকশাল আন্দোলনের খবরাখবর একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চারু ভাবছেন ''এটা কেন হল?'' ইতিমধ্যে তামিলনাডুর আপ্পুর মারফতে সিংহলের মার্কসবাদী–লেনিনবাদী পার্টির নেতা সম্মুখ দাশনের লেখা এক সমালোচনামূলক পত্র হাতে

এলো। এতে কোথায় ভারতের ইয়েনান হবে তা নিয়ে পার্টির প্রকাশ্য কাগজে বিবৃতি দিয়ে সরকারকে সচেতন করা, নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পার্লামেন্টকে একেবারেই ব্যবহার না করা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রথাকে একেবারই নাকচ করে শ্রমিক শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রভৃতি অভিযোগ ছিল সি পি আই (এম-এল) ও তার নেতা চারু মজুমদারের বিরুদ্দেধ। পিকিং রেডিওর বিষয়, এই সমালোচনা, সব মিলিয়ে চারু মজুমদার বল্লেন– ''সাহেবদের সাথে যোগাযোগ জরুরী হয়ে পড়ছে।''

লোক পাঠালেন যোগাযোগ করতে, চীনের পার্টির পক্ষ থেকে খবর এলো–''নেতৃস্থানীয় কমরেড পাঠাও নিজেদের দায়িত্বে।'' প্রথমে যে দুজনকে পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন চারু মজুমদার তার মধ্যে একজন পাশপোর্টই করতে চেষ্টা করলেন না, আর একজন প্রস্তুত হয়েও শেষ পর্যন্ত আটকে গেলেন, ফলে চীনে গেলেন তৃতীয় একজন। অবশ্য তাঁকেও চারু মজুমদার পাশপোর্ট করে রাখতে বলেছিলেন।

'৭০ এর ২০শে আগষ্ট নকশালবাড়ী এলাকায় দলবল সহ গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন কানু সান্যাল। ২৫শে আগষ্ট ইউরোপ ঘুরে চীনের পথে রওনা হয়ে গেলেন সি পি আই (এম-এল)–এর প্রতিনিধি,–পলিটব্যুরোর একজন সদস্য (কমরেড সৌরেন বসু)।

'কি তীব্র গতি বিপ্লবের?' ভাবছেন চারু। ''৭২ সালেই রিপাবলিক ঘোষণা করে দেবো, তারপর '৭৫ সালে তো মুক্তি। মুক্ত ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলদের চ্যালেঞ্জ জানাবো।'' –এর থেকে কমিয়ে ভাবা চারুর মধ্যে নেই। ''আরে বাবা, এই গতির মুখে পর পর নির্দেশ দিতে গেলে অনেক সময়ে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হতেই পারে! তাতে কি হয়েছে? দেখছো না, শ্রেণী সংগ্রাম সব অসঙ্গতি, সংস্কার, অসমতা ধুয়ে মুছে দিচ্ছে?'' চারুর শ্রেণী সংগ্রাম হল 'শ্রেণীশত্রু খতম অভিযান'।

একটি রেডিও ষ্টেশনের বড় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লেগেছেন তিনি। রেডিও মারফৎ খবরটা কত সহজে একেবারে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়? পিকিং রেডিও শুনে শুনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে চারুর। ''একটু আদটু বাড়িয়ে তো বলতেই হবে! বিপ্লবী অতিকথনে দোষ নেই।'' প্রতিনিধিকে চীন যাওয়ার সময়ে তাই বারবার বলে দিয়েছেন– ''প্রথমেই গিয়ে সাহেবদের বলবে একটি ওয়েল ইকুইপ্ট্ রেডিও ষ্টেশন যেন আমাদের দেওয়া হয়! কোথায় বসবে ষ্টেশন জিজ্ঞাসা করলে বোল কোথাও জায়গা না পেলে সমুদ্রের বুকে বোটে ঘুরে ঘুরে ব্রডকাষ্ট করে বেড়াবো।'' চারুর বলার ভাবে উত্তেজিত হয়ে সরোজ দত্ত সুব্বারাও পানীগ্রাহী লিখিত–''কমিউনিষ্টুলম্ মেমু কষ্টজীবৃ লম্'' তেলেগু সঙ্গীতটি টেপ করে ফেললেন এবং নিজেই তিনবার–''রেডিও লিবারেশন'' বলে রেডিও প্রচার শুরু করার প্রস্তুতি পর্ব সেরে রাখলেন।

সংগ্রামের ধরন, পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে লেগেছে পার্টির উপর ও নীচু মহলে। '৭০-এর আগষ্টেই সুশীতল রায়চৌধুরী মূর্তি ভাঙ্গা, স্কুল পোড়ানোকে উপলক্ষ্য করে এক সমালোচনা প্রবন্ধ পেশ করলেন পার্টির কাছে।

শ্রীকাকুলাম থেকে কর্মীরা জানাচ্ছেন–'শ্রেণীশত্রু খতম অভিযানের মধ্য দিয়ে মুক্ত এলাকা গঠিত হয়ে যাওয়া স্বপ্নবিলাস (utopia) ছাড়া আর কিছু নয়।'

মেদিনীপুর থেকে সমালোচনা আসে–'মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে একটার পর একটা খতম অভিযান চালিয়েছি। ব্যাপক গণ জাগরণ তো দূরের কথা, শত্রুর আক্রমণের সামনে আশ্রয়হীন অবস্থায় আজ আমরা ভ্রাম্যমান দলে (Roving bands) পরিণত হলাম কেন?'

মুশাহারীর সাড়া নেই, লক্ষ্মীমপুর খেরী স্তব্ধ।

সব শুনে একটিই জবাব দিয়েছেন চারু মজুমদার–''তোমরা পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্ব, ভূমিহীন ও গরীব কৃষককে নেতৃত্বে আনতে পারোনি, তাই এই ধাক্কা খাওয়া। চেয়ারম্যান বলেছেন ধাক্কা খাওয়া ভালো। শিক্ষা পাওয়া যায়।'

সংগ্রামের ধরন, পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে লেগেছে পার্টির উপর ও নীচু মহলে। '৭০-এর আগষ্টেই সুশীতল রায়চৌধুরী মূর্তি ভাঙ্গা, স্কুল পোড়ানোকে উপলক্ষ্য করে এক সমালোচনা প্রবন্ধ পেশ করলেন পার্টির কাছে।

শ্রীকাকুলাম থেকে কর্মীরা জানাচ্ছেন–'শ্রেণীশত্রু খতম অভিযানের মধ্য দিয়ে মুক্ত এলাকা গঠিত হয়ে যাওয়া স্বপ্নবিলাস (utopia) ছাড়া আর কিছু নয়।'

মেদিনীপুর থেকে সমালোচনা আসে–'মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে একটার পর একটা খতম অভিযান চালিয়েছি। ব্যাপক গণ জাগরণ তো দূরের কথা, শত্রুর আক্রমণের সামনে আশ্রয়হীন অবস্থায় আজ আমরা ভ্রাম্যমান দলে (Roving bands) পরিণত হলাম কেন?'

মুশাহারীর সাড়া নেই, লক্ষ্মীমপুর খেরী স্তব্ধ।

সব শুনে একটিই জবাব দিয়েছেন চারু মজুমদার–''তোমরা পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্ব, ভূমিহীন ও গরীব কৃষককে নেতৃত্বে আনতে পারোনি, তাই এই ধাক্কা খাওয়া। চেয়ারম্যান বলেছেন ধাক্কা খাওয়া ভালো। শিক্ষা পাওয়া যায়।'

চারু মজুমদারের নীতির বিরুদ্ধে সুশীতল–এর বক্তব্য

''ভারতীয় বিপ্লবের সমস্যা ও সঙ্কট'' শীর্ষক এক দলিল সুশীতল রায়চৌধুরী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে উপস্থিত করলেন। .... 'পার্টি গঠন তথা পার্টি কংগ্রেস সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ যোগাল, ছাত্রযুবদের উদ্বুদ্ধ করে তুলল এবং গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করার অবস্থার সৃষ্টি করল' এই কথা বলে সুশীতল রায়চৌধুরী দলিলে উল্লেখ করলেন যে মাও সে-তুঙ চিন্তাধারাকে বিকশিত করার নামে এই রাজ্যে এক উগ্র বামপন্হী নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এই নীতির লক্ষণ উল্লেখ করে তিনি দেখালেন যে ''৬৮-'৬৯ সালেও 'দেশব্রতী'র প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে বিপ্লবী যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। অথচ হঠাৎ এখন বলা হচ্ছে যে ততটা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার দরকার নেই এবং জ্যোতিষীর মত ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হচ্ছে যে ১৯৭৫ সালেই ভারত শোষণ মুক্ত হয়ে যাবে।'

'শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া এমনকি ছোট এবং মাঝারি বুর্জোয়ারা ভারতীয় জনগণের বিপুল সংখ্যা,' পার্টি প্রোগ্রামের এই বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি বল্লেন যে, সঠিক ভাবেই পার্টি প্রোগ্রামে এই সমস্ত শ্রেণীর যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নে বলা হয়েছে যে 'সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষকের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হলে এবং অন্তত কয়েকটি স্থানে লাল ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠিত হলে এই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে।'

কিন্তু 'এখন হঠাৎ হঠাৎ বলা হচ্ছে যে ওরা আমাদের সাথে আসতে বাধ্য হবে, তাদের পরোয়া আমরা করি না প্রভৃতি।' 'এমন কি প্রায়ই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে এই ধরনের বক্তব্যকে কার্যকরী করতে গিয়ে ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রভৃতিকে খতম করা হচ্ছে।'

তিনি বল্লেন–'মাও সে–তুঙ চিন্তাধারা অনুযায়ী কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলতে গেলে জনযুদ্ধের বিভিন্ন দিকগুলির ক্ষেত্রে কৃষকের উদ্যোগ জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশব্রতী পত্রিকায় ১৯৬৭ সালের ১লা আগষ্ট সংখ্যায় আমাদের এ সম্বন্ধে বক্তব্য খুব ভালোভাবেই রাখা হয়েছিল যে গেরিলাযুদ্ধ মূলত শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর পর্যায় এবং শ্রেণীসংগ্রাম হচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সংযুক্ত মোট ফল। রাজনীতি প্রচারের সময়ে কৃষক অঞ্চলের কমরেডদের সাধারণ অর্থনৈতিক দাবীর প্রশ্নটিকে খাটো করে দেখলে চলবে না। ব্যাপক আন্দোলন না হলে পশ্চাদপদ অংশকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা যাবে না।'

তিনি দেখান যে এই ধারণাকে অস্বীকার করে যে তাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থিত করা হচ্ছে তা হচ্ছে 'সম্পূর্ণ গোপনভাবে গেরিলা ইউনিট গঠন করতে হবে', এবং 'ষড়যন্ত্র মূলকভাবে তা করতে হবে', 'গেরিলা আক্রমণের আগে ব্যাপক প্রচার কাজ চালাবার প্রয়োজন নেই' প্রভৃতি। 'নকশালবাড়ীর সংগ্রামের সময়ে বলা হয়েছিল যে শ্রেণীসংগ্রাম বিকশিত করতে পার্টি ইউনিট গঠন করতে হবে, এবং সংগ্রাম গড়ে উঠলে এই পার্টি ইউনিটকেই গেরিলা ইউনিটে পরিণত করতে হবে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে গেরিলা ইউনিট ষড়যন্ত্রমূলক (conspiratorial) পদ্ধতিতে গঠন করতে হবে।'

দলিলে সুশীতল রায়চৌধুরী শহরে পার্টির কাজ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন–''আমাদের কর্মসূচীতে আমরা বলেছি যে শ্রমিকশ্রেণী তার নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করবে রাজনৈতিক প্রশ্নে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রের, বিপ্লবী শ্রেণীগুলির প্রতি সংহতিমূলক আন্দোলন করে বিশেষত কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামে সমর্থন জানিয়ে এবং তার সচেতন অগ্রণী অংশকে কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করতে ও নেতৃত্ব দিতে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে। এর থেকে এই কৌশলই বেরিয়ে আসে যে শহরাঞ্চলে শ্রমিকের অংশগ্রহণভিত্তিক সংহতি আন্দোলন; শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক গণকাজ করে তাদের অগ্রণী অংশকে গ্রামে পাঠানো; নির্বাচিত কর্মীদের দ্বারা ক্ষীর্ঘস্থায়ী প্রচার কাজ চালাবার জন্য শহরের গোপন পার্টি সংগঠন তৈরী করা।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ''আমাদের দেশে চীনের মত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার দরকার নেই'' বলে শহরে লাল সন্ত্রাস সৃষ্টি করাকেই শহরের একমাত্র কাজ হিসাবে গ্রহণ করা হল।

পার্টির কর্মসূচী ও কর্মকৌশলকে এড়িয়ে কাজ করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই পার্টি ও পার্টি কমিটিগুলির মধ্যে আলোচনা ও পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র চালানো যায় না, ব্যক্তি নেতৃত্বকেই প্রাধান্য দিতে হয়। 'গণফৌজ গঠিত হয়ে গেল', 'কমরেড চারু মজুমদারের লাইন', 'কমরেড চারু মজুমদারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব' প্রভৃতি বক্তব্য পার্টির পত্র পত্রিকার মধ্য দিয়ে পলিটব্যুরো, রাজ্যকমিটি কারও সাথে আলোচনার দিকে না গিয়ে প্রচলিত করে দেওা হয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যনারায়ণ সিং সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির সদস্যদের প্রতিবাদ পত্রকে গ্রাহ্যও করা হয়নি। উপরন্তু আপত্তিকারীদের 'সংশোধনবাদী' বা 'মধ্যপন্থী' আখ্যা দিয়ে পার্টি কর্মীদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।''

সুশীতল রায়চৌধুরীর এই দলিল পার্টির মধ্যে প্রচারের কথা বলা হলেও, আসলে প্রচারিত হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে দলিল পার্টির মিটিংএ রাখা হলেও বিস্তারিত আলোচনার

আগেই 'চারু মজুমদারের লাইনের' বিরুদ্ধে, সুতরাং নাকচ করা হোক' এই ভাবেই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে।

'৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সত্যনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে বিহার রাজ্য কমিটি তাঁদের সমালোচনামূলক দলিলের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনা দাবী করলেন। এই দলিলের প্রধান অভিযোগ ছিল পার্টিতে 'কর্তৃত্ববাদ' চলছে এবং শহরের কাজে সুশীতল রায় চৌধুরীর অনুরূপ বক্তব্যই রাখা হল। কৃষকের সংগ্রামের ক্ষেত্রে বলা হল 'আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি নির্বিচারে ধনীকৃষকদের খতম করা সঠিক নয়। তারমধ্যে অনেকেই সংগ্রামের চাপে আমাদের দিকে চলে এসেছে।' আমেরিকা কর্তৃক কাম্বোডিয়ায় হস্তক্ষেপকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু বলে পার্টি কংগ্রেসে চারু মজুমদার যে বক্তব্য-রেখেছিলেন এই দলিলে মাও সে তুঙ-এর ২০শে মে'র বিবৃতি উল্লেখ করে দেখানো হয় যে এই বক্তব্য সঠিক নয়। দলিলে এও বলা হয় যে 'সারা ভারতের সর্বত্র বিপ্লবী অবস্থা একই রকম পার্টি নেতৃত্বের এক অংশের এই বক্তব্য অসম বিকাশকেই নাকচ করছে।'

এই দলিলের উপর আলোচনা করতে চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, সত্য নারায়ণ সিং, শিবকুমার মিশ্র ও সুশীতল রায়চৌধুরী বসেন। চারু মজুমদার ও সরোজ দত্ত দলিলটিকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করেন। দলিলটিকে সমর্থন করেন শিবকুমার ও সুশীতল এবং এরপর থেকেই পশ্চিমবাংলার বাইরে পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ার অবস্থার সৃষ্টি হয়।

রেডিও ষ্টেশন দেয়ার আবেদন বাতিলঃ
নকশাল সমর্থনে চীনের অনীহা

২৮শে নভেম্বর সি পি আই (এম-এল)-এর প্রতিনিধি ফিরে এলেন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মতামত নিয়ে। চারুর শরীর তখন খুব খারাপ চলছে। প্রায়ই বুকে ব্যথা হয়। ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় চীনের পার্টির বার্তা নিয়ে যখন প্রতিনিধি দেখা করতে গেলেন, তখন চারু মজুমদারকে হাতপাখা দিয়ে বাতাসরতা গৃহকর্ত্রী বল্লেন—"আমাদের উনি বলেছিলেন রাত্রে আমি কেঁপে কেঁপে উঠবো, ঘুমও ভেঙে যাবে, কারণ আমি অনুভব করছি সে আসছে।"

একটু আশ্চর্যই লাগল, এ রকম অলৌকিক ধরণ তো চারুদার আগে ছিল না? যাই হোক, চারুর তখন আকুল আগ্রহ রেডিও স্টেশানের ব্যাপারটা কি হল? সে ব্যাপারটা চীনের নেতারা প্রায় হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন —'রেডিও স্টেশান তো বিশাল ব্যাপার, গোপনে পাঠানো হবে কি করে? আর তোমাদের তো স্টেশান স্থাপনের কোন জায়গাও নেই—ওটাতো সরকারই নিয়ে নেবে সাথে সাথেই।'

চারুর এতে বুঝ হয় না, একেবারে আর্তনাদের সুরে বলেন-জাহাজে করে মাদ্রাজের উপকূলে কোথাও তো পাঠানো যেত? আর্ত চিৎকারে বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। জল, পাখা নিয়ে সকলে ছুটোছুটি করতে লাগল। সব জিনিসটাই কেমন একটু করুণ মনে হতে লাগল। বিদেশ ফেরতা পার্টি প্রতিনিধির কাছে (লেখক স্বয়ং সৌরেন বসু) তাঁর অস্বস্তিও লাগছিল সকলের সামনে এই সব গোপন কথাবার্তা বলতে। সরোজ দত্ত বুঝলেন, বল্লেন-"সংকোচের কোন কারণ নেই, সবাই জানে। পার্টির নীচের কমিটিতে ফাংশানের পূর্ণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, নিজের নিজের কাজ সব নিজেরাই ঠিক করবে।"-একথা বলে সরোজ দত্ত সংকোচ কাটাবার জন্য বল্লেন—'বিদেশ থেকে কি সিগারেট এনেছ দেখি?'

চারু একটু সুস্থ হলেন। ''চীনের কমরেডরা সমালোচনা করেছেন'' বলতেই চারু বল্লেন ওসব পরে হবে, সব লিখে দিও।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে চৌ এন লাই ও কাং শেঙ সি পি আই (এম-এল)-এর প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করেন ১৯৭০ সালের ২৯শে অক্টোবর। আলোচনার উদ্বোধন করে চৌ-এন-লাই বলেছিলেন -''আমরা তোমাকে স্বাগত জানাই এবং তোমাদের পার্টির গঠনকে অভিনন্দন জানাই। তোমাদের পার্টি সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, মুৎসুদ্দি, পুঁজিবাদ এবং আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করেছে।.......ভারতের কমরেডদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আমাদের পার্টিকে সমৃদ্ধ করতে কেমনভাবে ব্যবহার করেছি। আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্য চীনা বিপ্লবের বিশেষ অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর কাজ করেছি। চেয়ারম্যান মাও এই ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ করেছেন এবং বিরাট বিকাশসাধন করেছেন।

তাই প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে চীনা বিপ্লবের বিভিন্ন মোড়ে চেয়ারম্যান মাও অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে চীনা বিপ্লবের বিকাশ, তাকে রক্ষা ও তার ত্রুটি সংশোধনের কাজ করে বিপ্লবের সাধারণ দিশাকে ঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। সার্বজনীন সত্য হলেও (মার্কসবাদ-লেনিনবাদ) তাকে যে কোন দেশেরই প্রকৃত অবস্থার সাথে যুক্ত হতে হবে, এবং সেটি হতে হবে সেই সেই দেশের বিপ্লবী কমরেডদের বিপ্লবী প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। এই ভাবেই এক এক দেশের বিপ্লবী কর্মসূচী রূপ পরিগ্রহ করে। এই ভাবের যে সার্বজনীনতা তা কিন্তু এক দেশ থেকে আর এক দেশে হুবহু আরোপ করা যায় না। ....

চৌ-এন-লাই বলে চলেন —''বিপ্লবের বিজয়ের আগে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হয়েছে এবং আমরা বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক লাইনের প্রশ্নে বিচ্যুতি করেছি। চেন-তু-শিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের লাইনের জন্য বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। কৃষি বিপ্লবের সময়ে আমরা তিন তিনবার বামপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতি করেছি। অর্থাৎ আমরা জনগণের ব্যাপক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। ...আমরা কারখানায় শ্রমিকদের কাছে বা স্কুলে ছাত্রদের কাছে যেতে অস্বীকার করেছি; কষ্টসাধ্য সাংগঠনিক কাজে বিমুখ হয়েছি। সাংহাইতে তথাকথিত ঝটিকা সভা সংগঠিত করতাম, বড় শহরগুলিতে উৎসব অর্থাৎ মে দিবস প্রভৃতিতে বড় বড় ব্যানার নিয়ে ছাত্রদের কিছু অগ্রণী অংশকে দিয়ে মিছিল করতাম। প্রথম প্রথম লোক জমতো। কিন্তু শীঘ্রই কর্মীরা পরিচিত হয়ে পুলিশের শিকার হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী যখন দমনপীড়ন চালাতে লাগল, তখন আমরা গোপন সশস্ত্র দল গঠন করে অত্যাচারী অফিসারদের হত্যা করলাম। এতে প্রথম দিকে লোককে কিছু উদ্বুদ্ধ করা যায়, কিন্তু গণজমায়েতের কাজে এই পদ্ধতি চলে না-প্রতিক্রিয়াশীলরা আমাদের চেয়ে অনেকগুনে শক্তিশালী ছিল।..........

চীনা নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ভারতীয় নকশাল আন্দোলনের মূল্যায়ন

''লিবারেশান পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম তোমাদের পার্টির শ্রেণীশত্রু খতম নীতির প্রকৃত অর্থ। আমরা গেরিলা যুদ্ধ বলতে যা মনে করেছি এটি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'গেরিলা এ্যাকশান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' এই

নামের প্রবন্ধ থেকে আমরা বুঝলাম যে চীনা বিপ্লবের পরাজয়ের দিনে আমরা যা করতাম তোমরা তাই করছো। অর্থাৎ ছোট স্কোয়াড দ্বারা গোপনে জমিদার হত্যা। এটি তো একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সংগঠন–জনগণের ব্যাপক অংশের উপর নির্ভর করা থেকে ভিন্ন। শুধু ধরনেই নয়, চরিত্রেও এটি প্রকৃত গেরিলা ইউনিট থেকে স্বতন্ত্র। আমরা মনে করি যে গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে জনগণ ও পার্টি সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকা বিপজ্জনক''।

চৌ এন লাই মাঝখানে মন্তব্য করেন– ''তার অর্থ গেরিলা স্কোয়াড স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় পার্টি সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন।''

কাং শেঙ বলতে থাকেন– ''আবার প্রবন্ধে এক সূত্র করা হয়েছে যে 'যে শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত লাল করেনি সে কমিউনিষ্ট নামের যোগ্য নয়'। এটি তো উপযুক্ত বক্তব্য নয়। এ ভাবে ভাবতে থাকলে তো পার্টি সংগঠনের চরিত্রই পাল্টে যাবে। উপরোক্ত কারণেই আমরা তোমাদের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করিনি — আর অনেক প্রবন্ধও তো কমরেড চারু মজুমদারের লেখা নয়।''

''আমাদের মনে হয়েছে যে তোমাদের সাধারণ দিশা ঠিক আছে, কেবল কয়েকটি নীতি (policy) উপযুক্ত নয় এবং মার্কসবাদ–লেনিনবাদ–মাও চিন্তাধারা সম্মত নয়। কৃষকদের মৌলিক স্বার্থ ও তার কৃষি সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করে সশস্ত্র সংগ্রামের কোন ভিত্তি থাকে না, তাই তা সফলও হয় না। জনগণের চেতনাকে নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে সব সময়ে তোলা হয়ে থাকে এবং যখন আমরা মৌলিক স্বার্থ, জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে এগুতে শুরু করি তখনই কেবল তাদের চেতনার স্তরকে উন্নত করতে পারি এবং সশস্ত্র সংগ্রামে জমায়েত করতে পারি। জনসাধারণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে তা কখনই করা যায় না।''

''তোমাদের শহরের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবন্ধতে কিছু বলা হয়নি। তোমরা প্রবন্ধে বলেছ যে চীনের সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমস্ত গণসংগঠনের পরিবর্তন করতে হবে। তোমাদের এরকম অনুকরণ–প্রবৃত্তি ঠিক নয়। তোমাদের প্রবন্ধগুলি থেকে দেখতে পাচ্ছি যে তোমাদের পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন সক্রিয় মনোভাব নেই।''

এই সময়ে চৌ–এন–লাই যোগ দেন–''তোমরা বলেছ যে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ আত্মরক্ষামূলক এবং অর্থনীতি বাদী। শুধু পার্টি সংগঠনই কেবল আক্রমণাত্মক ও জঙ্গী। এভাবে এই দুটিকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করানো উচিত না। তোমরা মনে করছো যে ছোট ছোট গোপন স্কোয়াড দ্বারা গুপ্তহত্যা আক্রমণাত্মক কাজ আর ব্যাপক মানুষের অর্থনৈতিক সংগ্রাম আত্মরক্ষামূলক। প্রশ্নটি আমাদের অনুধাবনের অপেক্ষা রাখছে এবং এটি একটি নীতিগত প্রশ্ন।''

এরপর আবার কাং শেঙ বলেন–'' আর একটি সমস্যাও আছে তা হচ্ছে মাঝারি কৃষকদের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে। বলা হচ্ছে যে মাঝারি কৃষকের গোপন গেরিলা কাজকর্মে যোগ দেওয়া উচিত না। আমাদের মনে হচ্ছে ভারতের মার্কসবাদী–লেনিনবাদী পার্টি এখনও পর্যন্ত কৃষি সংগ্রাম ও গেরিলা যুদ্ধের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নটির সমাধান করে উঠতে পারেনি। ... যখন আমাদের কমরেডরা এই প্রতিনিধি কমরেডকে জিজ্ঞাসা করল যে তোমরা জমি বিলির কাজ কিভাবে করলে? তোমাদের কি নির্দিষ্ট ভূমি–নীতি কিছু আছে? উনি তখন জবাব দিয়েছিলেন যে 'আমরা এখনও এ কাজ শুরু করিনি। কারণ এখনও পর্যন্ত

আমাদের কোথাও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সৈন্যবাহিনী নেই।' ''এইভাবে কি করে হবে? প্রথমে তো আমাদের একটি ভূমিনীতি ঠিক করতে হবে যার ভিত্তিতে কৃষককে জমায়েত করব, তারপর সশস্ত্র বাহিনী তৈরী হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে। তাছাড়া তো সব উল্টো প্রক্রিয়া (Reverse process)। এটিও আর একটি বিষয় যার অনুধাবন প্রয়োজন।''

''....সম্প্রতি অক্টোবর মাসের 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার একটি সংখ্যায় দেখলাম যে মার্কসবাদী -লেনিনবাদী পার্টির চেয়ারম্যান বলেছেন-'আমরা যদি ভুল করি আমাদের তা শোধরাবার চেষ্টা করতে হবে কারণ ভ্রান্ত রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যপদ্ধতি বিপ্লবী কাজের শত্রু। আমাদের এগুলি বাড়তে দেওয়া উচিত না।' তাই একথা যদি বলে থাকেন তবে কমরেড চারু মজুমদার ঠিকই বলেছেন। তবে ভ্রম সংশোধন করতে হবে ধাপে ধাপে যাতে জনগণ ও পার্টি সদস্যদের বিপ্লবী উৎসাহে ধাক্কা না লাগে।''

''দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে যে নীতির সংশোধনে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত দিয়ে ভুল সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের (অর্থাৎ ভারতের পার্টির) একটি পরিস্কার কৃষিনীতি থাকা উচিত। আর এই নীতি প্রস্তুতের সময় জনগণের মনোভাবের সাথে খাপ খাইয়ে তা করতে হবে। তার অর্থ আমরা জনগণের ধ্যানধারণার সার সঙ্কলন করব, তারপর তা নীতি বা প্রস্তাবে পরিণত করবো এবং জনগণের মধ্যে কার্যকরী করব। ভুল বা অনুপযুক্ত নীতিগুলিকে সংশোধন করতে হবে বাস্তব গঠনমূলক কাজের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।''

চৌ-এন-লাই মন্তব্য করেন - ''আমি কমরেড কাং-এর মতকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। কঠোর জীবনযাপন, মৃত্যু, বলিদান সবই দেখতে হবে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে (Dialectical)। মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই না। কিন্তু মৃত্যু প্রয়োজনীয় হওয়া চাই। হঠকারী এবং বৃথা মৃত্যু অপ্রয়োজনীয়।''

''আমরা, কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা, এরকম এ্যানার্কিষ্ট কার্যকলাপের সাথে একমত হতে পারি না।''

চীন প্রত্যাগত প্রতিনিধি চৌ এবং কাং-এর বক্তব্য আলাদা করে লিখে দিলেন চারুর কাছে। প্রায় সাথে সাথেই চারু মজুমদারকে ডাক্তারের উপদেশ মত পুরীতে পাঠানো হল।

পুলিশ বাহিনীর উপর নকশাল হামলায় নয়া পরিস্থিতি

'৭০-এর নভেম্বর থেকেই পুলিশের উপর আক্রমণ সংগঠিত ভাবেই শুরু হল। কলকাতা শহরে 'মূর্তি ভাঙার আন্দোলন' শুরু হওয়ার সময়েই চারু মজুমদার বল্লেন-''আমাদের পার্টির কেন্দ্রীকরণ থাকবে লাইনের বেলায়, এ্যাকশানে স্কোয়াডগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।'' উর্দ্দিবিহীন কনষ্টেবল হত্যা, স্কুলে আগুন দেওয়া, পতাকা তোলা, শিক্ষক ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতার উপর হামলা প্রভৃতি এ্যাকশান চলতে থাকলো একেবারেই স্থানীয় স্কোয়াডগুলির উদ্যোগে। স্থানীয় উদ্যোগ খুলে দিতে গিয়ে নূতনত্ব যেটি দেখা গেল তা হচ্ছে তরুণদের মধ্যে দুঃসাহসী হিসাবে এককালীন মস্তানরাই সবার আগে এসে গেল এবং স্কোয়াডগুলির নেতৃত্বেও চলে যেতে লাগল। অনেক অঞ্চলে অন্যান্য রাজনৈতিক দল (অনেক সময়েই কংগ্রেস) পুরানো বিবাদের সমাধানের কাজে স্কোয়াডগুলিকে ব্যবহারও করতে লাগল। সি পি আই (এম-এল) থেকে একটি প্রচারপত্র দেওয়া হয়েছিল পুলিশকে উদ্দেশ্য করে যে 'পুলিশও গরীব এবং জনগণের ঘর থেকেই

এসেছে। পুলিশের উচিত সশস্ত্র সংগ্রামে সাহায্য করা। আমরা পুলিশের উপর আক্রমণ ততক্ষণ চালিয়ে যাবো যতক্ষণ পুলিশের চৈতন্যোদয় না হয়', প্রভৃতি।

'৭০ সালের অক্টোবর মাসে দার্জিলিঙ জেলা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সীমানায় অবস্থিত পঃ দিনাজুরের মাগুরজানে নকশালপন্থীরা 'ডাক' নদীর রেলের পুল পাহারারত হোমগার্ডের ক্যাম্প থেকে পাঁচটি রাইফেল দখল করে। এই ঘটনা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সি পি আই (এম-এল) কর্মীদের মধ্যে এক নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। পার্টির পত্রপত্রিকার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সারা ভারতের সংগ্রামের মধ্যে যোগসুত্রের কারণেই 'মাগুরজানের' ঘটনা এবং 'নকশালবাড়ি এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ নতুন করে শুরু হল- এমন এক ধারণা পার্টি কর্মীদের মধ্যে বলবৎ হল।

কলকাতায় '৭০ সালের মাঝামাঝি থেকেই পুলিশ গুলি করে হত্যা শুরু করে দিল। ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দক্ষিণ-বাঙলায় পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালাতে লাগল।

'৭০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ এবং সাঁওতাল ,পরগণার বারহাওরা প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বে বীরভূম জেলার প্রায় সর্বত্র ও মুর্শিদাবাদ এবং সাঁওতাল পরগণার কিছু অংশে গেরিলা এ্যাকশান ও খতম অভিযান শুরু হল। বীরভূম, মুর্শিদাবাদের কলেজ ছাত্র ও উত্তর কলকাতার তরুন কয়েকজন স্কুল শিক্ষক এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়। '৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই অভিযানে জমিদার খতম ও প্রায় ১২৬ টা জোতদারের বন্দুক দখল হয়ে যায়। জমিদার অধ্যুষিত বীরভূম জেলার জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। অন্য সব জায়গার মতই প্রথম প্রথম কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়, জমিদারবিহীন গ্রামকে মুক্তাঞ্চল মনে করে বিপ্লবী কমিটিগুলি গঠিত হয় এবং কিছু জমি বন্টনও হয়।

এই সংগ্রাম মতানৈক্যে জর্জর সি পি আই (এম-এল)-এর মধ্যে চারু মজুমদারের সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে উৎসাহ যোগাল- 'চারুর লাইনই সঠিক' বলার একটা জোরও উপস্থিত হল। বীরভূমের 'কমরেডদের প্রতি' চারু লিখলেন -''তোমরা সংগ্রামকে উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়েছ। কেবল খতম অভিযানে আবদ্ধ থাকলে তা হবে সংশোধনবাদ, তোমরা গরীব ও ভূমিহীন কৃষককে রাজনীতি দাও, চেয়ারম্যানের কোটেশান ও গেরিলা বাহিনীর নীতিগুলি শেখাও এবং সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তুনি করেত থাকো।''

দেশব্রতী পত্রিকা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বীরভূমের সংগ্রামকে প্রকাশ করতে থাকে। একটা কথা রটে যায় যে ঐ অঞ্চলে স্থানীয় পুলিশ বিপ্লবীদের সাহায্য করে চলেছে। একথাও শোনা গেল যে বহু ক্ষেত্রে মহাজনরা সংগ্রামীদের টাকা পয়সা দিয়ে সমঝোতা করে নিচ্ছে।

'৭১-এর জুলাই থেকে প্রায় আট হাজার কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী নিয়ে এবং কিছু পরে সরাসরি সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এই অঞ্চল আক্রমণ করল সরকার এবং প্রায় কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই তারা অভিযান চালালো। গ্রামের মানুষ বলল বাইরের লোক এসে এসব করেছে। গ্রামের মানুষের পুলিশের কাছে জাবানন্দীকেও 'জনগণের বিপ্লবী চেতনা' আখ্যা দিয়ে দেশব্রতীতে লেখা হল- 'জনগণ বিপ্লবীদের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখার জন্য তাদের সংখা বাড়িয়ে বলছে। বিপ্লবী সংগ্রামের কি প্রভাব!'

ওখানকার আঞ্চলিক কমিটিও সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখল - ''জনগণের মিলিশিয়া গঠন করে সশস্ত্র করায় ব্যর্থতা, গেরিলা দল, পার্টি ও বিপ্লবী কমিটির সম্পর্কে বিন্যাসের অভাব, শত্রুর শক্তিকে খাটো করে দেখা, মুক্তাঞ্চল সম্পর্কে এক কাল্পনিক ধারণা এবং

পাহাড়, জঙ্গলের মত উপযুক্ত 'টেরেন'–এ ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের চেষ্টা না করায় রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি অতি সহজেই আমাদের সংগ্রামের ফলকে ছিনিয়ে নিতে পারল।''

'৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরীতে চীনা পার্টির বক্তব্য বিষয়ে আধঘন্টার মত কথা হয় চারু মজুমদারের সাথে চীন প্রত্যাগত কমরেডের। চারু শুধু মন্তব্য করেন–'' কিছু একপেশে কাজ তো আমাদের হচ্ছেই।''

একটি প্রশ্ন উঠতে থাকে যে চীনা পার্টির সমালোচনা ও পরামর্শ পার্টিতে জানানো প্রয়োজন। সুশীতল রায় চৌধুরীর সাথে সম্পর্ক তিক্ততম পর্যায়ে তখন। তাঁর মতামত না নিয়েই তাঁকে পার্টি পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। '৭১–এর জানুয়ারীর এক রাজ্য কমিটির বর্দ্ধিত সভায় দুই তিন জন সদস্য ঐ সভা থেকেই সুশীতলকে বহিষ্কার করতে চায়। চারু মজুমদার বলেন– 'সুশীতলবাবু পলিটব্যুরোর সদস্য, তোমরা বহিষ্কার করার কে?'

সুশীতল সভায় উপস্থিত ছিলেন– তিনি রাজ্য কমিটির সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি চান। চারুর পরামর্শ মত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে সুশীতল রায় চৌধুরী হুগলী জেলায় নিজের পছন্দমত এলাকা বেছে নিয়ে নিজের 'লাইন' চালাবেন– সভায় একজন বলেন–''কিন্তু মুখ খুলতে পারবেন না।'' চারু বলেন– ''তা কি করে হবে? আমরা তো ওঁর বক্তব্য নিয়ে কাজ করার জন্যই ওঁকে একটা এলাকা দিচ্ছি!'' সুশীতল সেই থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাঁর সাথে দেখা করাও সম্ভব ছিল না, এবং মাসে দুশো টাকা পার্টি বেতনও তাঁর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল '৭০ সালের শেষ ভাগ থেকেই,–এটা আবার চারু মজুমদারের জানা ছিল না। সুশীতল রায় চৌধুরী চীনা পার্টির বক্তব্য শেষ পর্যন্তও জানতে পারেন নি।............

চীনের পার্টির বক্তব্য প্রচার না করা হলেও ছাড়া ছাড়া ভাবে কতকগুলি অদ্ভুত প্রচার চলতে লাগল, যার উৎস কখনই স্পষ্ট হয়নি। '৭১ সালেই পার্টির মধ্যে অনেক স্থান থেকে প্রশ্ন উঠতে থাকে –''চীন থেকে নাকি বিশেষ বক্তব্য এসেছে, তা কী?'' –এই প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই বোধ হয় একটি প্রচার হয় যে– ''একজন ব্যক্তিই যাওয়ার ফলে ঠিক কি বলেছেন চীনের কমরেডরা তা স্পষ্ট নয়।'' আবার আর এক প্রচার হয় যে ''সি পি আই (এম–এল) প্রতিনিধি লন্ডনে ফিরে এসে দোদুল্যমান হ'য়ে পড়েন।'' তৃতীয় প্রচারটি হয় যে, ''চেয়ারম্যান মাও স্বয়ং ভারতের প্রতিনিধিকে বলেছেন যে তোমরা আমার লাইনেই আছো, চালিয়ে যাও।''

'৭১ সালে কলকাতার জেলগুলি ভরে উঠেছে, কলকাতা জুড়ে চলেছে সামরিক বাহিনীর চিরুনি–অভিযান, হত্যাকান্ড, বরানগরের মত বীভৎস খুনের কান্ড যেখানে কংগ্রেস সি পি (এম) ও পুলিশ মিলে ১৫০ জনেরও উপর তরুণকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করেছিল। নকশাল সি.পি. (এম) খুনোখুনিও চলছে বিশেষত কলকাতায়, কোথাও খুন হয়েছে সি,পি, (এম) কর্মী, কোথাও নকশাল কর্মী।

জেলে নকশাল বন্দীদের সম্বন্ধে পার্টির নির্দেশ ছিল (নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সরোজ দত্তের নামে) যে 'সংশোধনবাদীদের মত জেলে শান্তিতে বসবাস করার জন্য শাসক শ্রেণীর কাছে বিকিত হওয়া, প্রথম শ্রেণীর সুবিধা গ্রহণ, আইনের সাহায্য নেওয়ার জন্য মামলা চালানো, জামীন নেওয়া প্রভৃতি আমাদের জন্য নয়। জেলের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে সেখানেও গেরিলা সংগ্রাম চালাতে হবে এবং জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে।' এই নির্দেশের পর পশ্চিম বাংলার জেলগুলিতে বীভৎস হত্যাকান্ডে অসংখ্য নকশাল–কর্মী জীবন

দিয়েছে,. জেল থেকে পালাতে গিয়ে পিটিয়ে মেরেছে পুলিশ। আবার কয়েকটি জেল থেকে সফলভাবে পালিয়েও এসেছে কর্মীরা ।

মুজিবের সমালোচনায় চারু মজুমদারঃ
নকশালদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ

'৭১ সালে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ঘটনাবলী সি পি আই (এম–এল) – এর মধ্যে আর এক প্রস্থ মতবিরোধ সৃষ্টি করল, আবার চারু মজুমদারের সমর্থক কর্মীদের মধ্যে নতুন এক উৎসাহও সৃষ্টি করল।

'৭০ সালের মধ্যভাগের দিকেই পূর্ব পাকিস্তানে মুহম্মদ তোহার মত বামপন্থী কমিউনিষ্ট শ্রমিক নেতার (তোহা মৌলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগেরও সম্পাদক ছিলেন) নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী– লেনিনবাদী) বা E.P.C.P.(M.L) গঠিত হয়েছিল। চীনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, পিকিং রেডিও মারফৎ নকশালবাড়ির আন্দোলন ও সি পি আই (এম–এল)–এর বক্তব্য শুনে ওঁরাও গ্রামে জমিদার খতম (Battle of annihilation) এবং 'গেরিলা এ্যাকশান' শুরু করে দেন।

'৭১ সালে চারু মজুমদার ই,পি.সি.পি (এল–এল)–এর প্রতি এক অভিনন্দন বার্তায় বলেন – ''আপনারা উগ্রজাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা ও শ্রেণীশোষণের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করে পূর্ব বাংলার মুক্তির পথ তৈরী করেছেন।'' মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খাঁর শাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল চারু তাকে সংস্কারবাদী ও কায়েমী স্বার্থরক্ষাকারী আখ্যা দিয়েছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের উপর ভরসা করছিলেন যে এই শ্রেণীসংগ্রামই দুই বাংলাকে এক করে আবার শ্রেণীশোষণমুক্ত 'সোনার বাঙলা' গঠন করবে।

পার্টির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা নিয়ে যে তুমুল বিতর্ক উঠেছিল তা ছিল মূলত 'সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী' কর্তৃক পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে সিপি আই (এম–এল)–এর কর্তব্য সম্বন্ধে। বিতর্কে কোন পক্ষই পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙক্ষায় পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে হিসাবের মধ্যেই আনেননি। যাঁরা বলেছিলেন যে ভারত সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের শাসক বর্গকে সাহায্য করা উচিত (চীনেরও এই বক্তব্যই ছিল, এদের প্রধান বিবেচ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সোভিয়েত প্রভাব বেড়ে যাবে।)

তাঁদের জবাবে চারু মজুমদার বললেন – ''ইয়াহিয়া খাঁকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের নয়। তবে পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের প্রশ্নে আমরা ইয়াহিয়া খাঁকে সমর্থন করবো, কিন্তু আমাদের প্রধান কাজ সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা এই সুযোগে পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশী আক্রমণ পর্যুদস্ত করে প্রকৃত মুক্তি নিয়ে আসা।'' চারু মজুমদারের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নামে সরোজ দত্ত বক্তব্য রাখলেন যে– '' সমাজতন্ত্রের বিশ্ব বিজয়ের যুগে আজ কোন জাতীয় বুর্জোয়ার পক্ষেই জাতীয় মুক্তি আনা সম্ভব না। বিশেষত পাকিস্তান ভারতের মতই উপনিবেশ থেকে এখন আধা উপনিবেশ । সেখানকার মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষই করবে।

সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম'কে সমর্থন করতে গেলে ক্রুশ্চভের তত্ত্বকেই বিশ্বাস করতে হয় যে উপনিবেশ ও আধা–উপনিবেশে জাতীয় বুর্জোয়ারা স্বাধীন সরকার গঠন করতে পারে কেবল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রভাবের দ্বারাই। ভারতের উপর মার্কিন প্রভাবের

বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শাসকশ্রেণী নিছক আত্মরক্ষার জন্যই চীনের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখেছে। এটা ঠিকই যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতে ঘাঁটি করে চীনের উপর আক্রমণ করতে চায়। এক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খাঁর ন্যায্য সংগ্রামে আমরা সমর্থন করব, কিন্তু তার সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।''

শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সি পি আই (এম-এল)-এর কোন পক্ষের তরফ থেকে কার্যকরী কিছু হয় নি। ই.পি.সি.পি (এম-এল)-এর একটি বড় অংশই বাংলাদেশ মুক্ত করার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশ গঠিত হবার সময়েই পার্টিতে যে মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠলো তাতে পশ্চিম বাংলার মালদহ-পশ্চিম দিনাজপুর, বীরভূম থেকে যেমন আত্ম সমালোচনামূলক বক্তব্য ও 'খতম অভিযান' এবং 'গেরিলা যুদ্ধ' সম্বন্ধে পার্টিনীতির সঠিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে লাগল, মেদিনীপুর থেকে সরাসরি চারু মজুমদারের প্রতিই 'কর্তৃত্ববাদ', 'উগ্র বামপন্থী লাইনের প্রবক্তা' প্রভৃতি অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকার ও চীনা পার্টির সমালোচনা পার্টির মধ্যে প্রকাশ করার দাবী করা হল।

মেদিনীপুরের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসলেন সরোজ দত্ত। চীনা পার্টির সমালোচনার প্রশ্নটিকে সরাসরি স্বীকার না করে সরোজ দত্ত বললেন- ''আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে যদি আমাদের কিছু ত্রুটি থাকে তো ধীরে ধীরে তা শোধরানো হবে। যারা পিকিং রেডিও শুনে ঠিক করে চারু মজুমদারকে সমর্থন করা উচিত কিনা তারা বাইরের উত্তাপ দিয়ে চেতনা বাড়াতে চায়, সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখে না। চীনের পার্টি ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টি, বিশ্ব বিপ্লবের নেতা নন, নেতা চেয়ারম্যান মাও। চীনা পার্টির বক্তব্যের সাথে আমাদের বক্তব্য না মিললে আমরা আমাদের বক্তব্যের উপরেই দাঁড়াবো, কারণ তা ভারতীয় সমাজের বাস্তব থেকে বেরিয়ে এসেছে। লেনিন যেমন বলশেভিক পার্টি গড়েছিলেন, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যেমন চেয়ারম্যান মাও-এর হাত দিয়েই গড়ে উঠেছিল, তেমনই ভারতের ইতিহাস কমরেড চারু মজুমদারের উপর সেই দায়িত্বই পালন করার ভার দিয়েছে। তাই ভারতের আজকের পরিস্থিতিতে কমরেড চারু মজুমদারই কেন্দ্রীয় কমিটি।''

সুশীতল হার্ট ফেল ঃ সরোজ ও আম্পু নিহতঃ কোদনরাম নিখোঁজঃ চারু বহিস্কৃত

'৭১ সালের ১৩ মার্চ আত্মগোপন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন সুশীতল রায় চৌধুরী। ঐ সালেরই ৪ঠা আগষ্ট গভীর রাতে গ্রেপ্তার করে সরোজ দত্তকে পুলিশ কলকাতা ময়দানে নিয়ে গুলি করে মারে।

হত্যাকান্ডগুলি চারুকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। এক একজনের খবর যখন পান চোখ দিয়ে তাঁর অঝোরে জল ঝরে। নিজের মনে বলেন- ''আমরা তো মানুষ। এত ভালো ভালো কমরেডের বিয়োগে কষ্ট তো পাবই। কিন্তু বিপ্লবী হিসেবে জয়ের অস্ত্র তৈরী হবে।''

তাঁর কল্পনার রথ থামতে জানে না, এগিয়ে চলে। কমরেডদের জানান- ''অত্যাচারীদের অত্যাচার বেড়ে যাওয়া মানেই তারা ভীত হয়ে পড়েছে। অত্যাচারিত মানুষ যখন অত্যাচার আর সহ্য করতে পারবে না তখন আপনা থেকেই বিদ্রোহ শুরু করবে।''

কলকাতায় নীচের পার্টি কমিটিগুলিতেও বিতর্ক উঠতে থাকে। 'চারু মজুমদারের কর্তৃত্বের বিরোধিতা' করার জন্য দুজনকে প্রাণও দিতে হল। চারু মজুমদার শুনে বললেন ''এভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না। বিরোধী মতের প্রতি আরও সহনশীল হতে হয়।'' কিন্তু

রাজ্য কমিটির নামে ঐ হত্যাকান্ডের সপক্ষে যে সার্কুলার দেওয়া হল তার সম্বন্ধে তার কোন মন্তব্য পাওয়া গেল না।

'৭১-এর নভেম্বরে বিহারে সত্যনারায়ণ সিং এক কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং ডাকলেন। পশ্চিম বাংলার অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে চারু ও সুনীতি ঘোষ ঐ মিটিং-এ গেলেন না। অসীম যেতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন মাঝপথে। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য অঞ্চলের সদস্যদের মধ্যে অন্ধ্রের অবশিষ্টরা জেলে, তামিলনাড়ুর এল আপ্পু নিহত ও কোদনরামের খোঁজ নেই, কেরালার আম্বাডি ইতিমধ্যেই কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, জম্মু কাশ্মীরের আর পি. স্রফও কারাগারে, শিবকুমার মিশ্রও তাই – কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের অবশিষ্ট চারজনের মধ্যে বিহারের দুজন ছাড়া পাঞ্জাবের ও উত্তর প্রদেশের একজন এই মিটিংএ ছিলেন কিনা জানা যায়নি।

যাই হোক এই মিটিং থেকে চারু মজুমদার ও জেলে বন্দী অন্যান্য 'চারু-পন্থীদের' পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং সত্যনারায়ণ সিংকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। একটি প্রস্তাবে পার্টির কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্য 'চারু মজুমদারের সংকীর্ণতাবাদী' লাইনের সংশোধন করে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত করা হয়। ধনী কৃষকদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে 'সব ধনী কৃষককে শ্রেণী শত্রু গণ্য করা উচিত নয়'। সি, পি, (এম)-এর সাধারণ কর্মীদের কাছে গণ আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য এক আহ্বানও জানানো হয়। 'চারু মজুমদারের সঙ্কীর্ণতাবাদ'-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যে সব প্রস্তাব নেওয়া হয় তাতে কৃষি কর্মসূচী বা শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব নেওয়া হয়নি। চারু মজুমদারের জীবিত কাল পর্যন্ত ঐ সিদ্ধান্তগুলির কার্যকারিতা অনুভব করা যায়নি।

৭২ সালের প্রথম থেকেই চারু তাঁর পুরানো বক্তব্যের কিছু কিছু পরিবর্তন করতে থাকেন। এই পরিবর্তনের মধ্যে ফসল দখল, জমিবিলির কথাও উল্লেখ করেন। তবে সেগুলি এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখলের অবস্থায় করার কথা বলেন এবং প্রধান জোর দেন 'গণফৌজ গঠনের' উপর। মাগুরজানের (পঃ দিনাজপুর) রাইফেল ছিনতাইএ ভূমিহীন কৃষকের অংশ গ্রহণকে 'ইতিহাসের মোড় ঘোরানোর' ঘটনা বলে উল্লেখ করে বলেন-''কেবল শ্রেণীশত্রু খতমের অভিযান চালানো এখন অর্থনীতিবাদ । রাইফেল দখলের কথা, গেরিলাযুদ্ধের নীতিগুলির কথা ও মাগুরজানের জ্বলন্ত উদাহরণ দিয়ে ভূমিহীন ও গরীব কৃষককে রাজনীতি দিতে হবে। এইটেই এখন 'মাস লাইন'। ভেবে দেখো একজন ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের হাতে যদি রাইফেল আসে তবে দুনিয়ায় সে কাউকেই পরোয়া করবে না। সে শ্রেণীশত্রু খতম করল কিনা তাতে কিছু এসে যায় না। মাগুরজানই গণফৌজ গঠণের প্রথম পদক্ষেপ। এইভাবে কিছু রাইফেল হাতে পেলেই ঐ ভূমিহীন কৃষকই গণফৌজ মার্চ করিয়ে দিবে ভারতের বুকের উপর দিয়ে।'' ব্যক্তি কর্তৃত্বের বিরোধীরা পার্টিতে নেই, তাই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এখন 'শ্রদ্ধেয় নেতা' আখ্যায় পৌঁছেচে। শ্রদ্ধেয় নেতার এই কথাকে আরো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ২৬শে ডিসেম্বর ভারতের বুকে গণফৌজের লঙ মার্চ দিবস বলে ঘোষনা হয়ে গেল মুখে মুখে।

চারুর শরীর আরো খারাপ । বিছানায় শুয়েই প্রায় থাকতে হয়। আশ্রয় স্থলও কমে যায় ধীরে ধীরে। পুলিশ-মিলিটারীর অত্যাচার, কংগ্রেস, সি পি (এম)-এর হামলা, পাড়া প্রতিবেশীর উপর পুলিশ ও দলীয় জুলুম-এর চাপে এবং স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় নীচতলার

তরুণদের বেশ একটা অংশ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। শয্যায় শুয়েও চারুর কল্পনার আশাবাদে ছেদ পড়ে না। ....

পাঞ্জাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ পাজাবের কমরেডরা এসে চীনা পার্টির বক্তব্যের বিষয় জানতে চান চারুর কাছে। অন্ধ্র থেকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের এম-এল পার্টির তরফ থেকেও অনুরূপ প্রতিনিধিরা এসে একই বিষয় জানতে চান। এই আলোচনা সম্বন্ধে মুখে মুখে প্রচারিত যতটুকু জানা যায় তাতে প্রকাশ যে, চারু মজুমদার চীনের পার্টির এই সমালোচনার সথে একমত ছিলেন না। তিনি কেবল 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়াম্যান' বক্তব্যটি তুলে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি নাকি সময়মত ঐ সমালোচনা পার্টিতে প্রচার করার বিষয়ে বলেছিলেন যে, চীনের কমরেডরাই চাননি যে তা তাড়াতাড়ি করা হোক। এই সব বক্তব্যের মধ্যে '৭১ সালের এপ্রিল মাসে যে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকার কথা হয়েছিল তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ অন্ধ্রের বার্তাবহকে লিখিতভাবে ঐ কথা জানানো হয়েছিল। চারু কখনও ঐ ঘটনা কাউকে বলেছেন বলে জানা যায় না।

রাজ্য কমিটির দু'জন সদস্য
চারু মজুমদারকে ধরিয়ে দিলেন (?) ঃ
পুলিশ লক–আপে চারুর মৃত্যু

১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই কলকাতার এক আশ্রয়স্থল থেকে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন চারু মজুমদার। তাঁর গ্রেপ্তারের কিছু আগে যে দু'জন রাজ্যকমিটির সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিল, তারা প্রবল অত্যাচারের মুখে চারুর আশ্রয় স্থলের কথা প্রকাশ করে ফেলে বলে শোনা যায়। পরবর্তীকালে ঐ দু'জনের বক্তব্য ছিল এমন কিছু অত্যাচার তাদের উপরে হয়নি — তারা ইচ্ছা করেই চারু মজুমদারকে ধরিয়ে দিয়েছিল। কারণ, তাদের ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছিল যে আত্মসমালোচনার নামে একটি গণ আত্মসর্পণের চিন্তাভাবনা নাকি চারু মজুমদার করছিলেন, যাতে এদের ঘোর আপত্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে এদের সকলের কাছেই চারু মজুমদার ভারস্বরূপ হয়ে পড়েছিলেন-এক সময়ে আত্মদানের বক্তব্য যারা সবাইকে বলছিল আত্মরক্ষার তাগিদে তারা স্বয়ং চারু মজুমদারকেই বলি দিল।

গ্রেপ্তারের পর লাল বাজারের সেন্ট্রাল লক আপে ১২ দিন ধরে ক্রমাগত একটি হৃদরোগীকে অনর্গল জেরা করে করে তার জীবনীশক্তি নিঃশেষ করতে পুলিশের খুব বেগ পেতে হল না। ২৮শে জুলাই চারু মজুমদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। (সংক্ষেপিত)

কমরেড চারু মজুমদার
পিতা ঃ পন্ডিত বীরেশ্বর মজুমদার
জন্ম ঃ ১৯১৭ বেনারস।
কলেজ জীবন ঃ পাবনা এডোয়ার্ড কলেজ
মৃত্যু ঃ ২৮শে জুলাই ১৯৭২
কোলকাতার পুলিশ হেড অফিস লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপ-এ

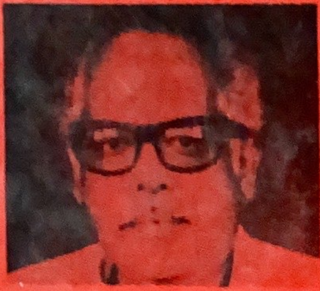

অপ্রতিরোধ্য, বেপরোয়া, দুঃসাহসী অথচ ধৈর্যশীল স্বভাবের ৫৪ বর্ষীয় 'যুবক' এম আর আখতার মুকুল— সেই যে ছোটবেলায় বাংগালী ঘরাণার রেয়াজ মাফিক দু'দুবার বাড়ি থেকে পলায়ন পর্ব দিয়ে শুরু করেছিলেন নিজের জীবন, তারপর থেকে আজ অবধি বহু চড়াই উৎরাই বহু উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে যেতে হলেও আর পেছনে ফিরে তাকাননি। অসম্ভব সংগ্রামী জীবন। পিছপা হননি কোনও পরিস্থিতিতেই। রুখেই দাঁড়িয়েছেন অকুতোভয়ে। যার ফলে শেষ অবধি সব ক্ষেত্রেই পেয়েছেন বিজয়ীর মুকুট।

জীবিকার তাগিদে কখনও তাকে এজি অফিস, সিভিল সাপ্লাই একাউন্টস, দুর্নীতি দমন বিভাগ, বীমা কোম্পানীতে চাকুরী করতে হয়েছে। কখনও আবার সেজেছেন অভিনেতা, হয়েছেন গৃহশিক্ষক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যবস্থাপক পরিচালক, সুদূর লণ্ডনে চামড়াজাত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর কাটার। প্রতিটি ভূমিকাতেই অনন্য সাফল্যের স্বাক্ষর। কখনও হাত দিয়েছেন ছাপাখানা, আটা চাল, কেরোসিন, সিগারেট, পুরানো গাড়ি বাস-ট্রাকের ব্যবসায়। করেছেন ছাত্র রাজনীতি ১৯৪৮-৪৯ সালে জেল খেটেছেন। জেল থেকেই স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়েছেন। অংশ গ্রহণ করেছিলেন ভাষা আন্দোলনে, হাসিমুখে বরণ করেছেন বিদেশের মাটিতে তিন বছরের নির্বাসিত জীবন। যখনই যা-কিছু করেছেন সেটাকেই স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল করেছেন। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন প্রায় দুই যুগের মতো। কাজ করেছেন বেশ কিছু দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও বার্তা সংস্থায়— বিভিন্ন পদ ও মর্যাদায়। বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে রিপোর্টার হিসাবে। সফর-সংগী হয়েছেন শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, ইস্কান্দার মীর্জা, আইউব খান, তাজউদ্দীন, বঙ্গবন্ধুর মত দুর্ধর্ষ নেতাদের। সাংবাদিক হিসাবে ঘুরেছেন বিশ্বের অসংখ্য দেশ। দেখেছেন বহু বিচিত্র মানুষ, প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন বহু রুদ্ধশ্বাস চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রবাহের, সাক্ষী ছিলেন বহু ঐতিহাসিক মুহূর্তের। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবন। বঙ্গবন্ধুর উষ্ণ সান্নিধ্য ও ভালবাসা তার জীবনের এক অবিস্মরনীয় স্মৃতি।

জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় উজ্জ্বল মুহূর্ত ১৯৭১-এর ৭ই ডিসেম্বর সদ্যমুক্ত যশোরে পদার্পন এবং ১৯ তারিখে সরাসরি মুজিবনগর থেকে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে ঢাকা প্রত্যাবর্তন। আর সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়ঃ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অন্যতম স্থপতি এবং নিয়মিত রণাংগন পরিদর্শন শেষে লেখক ও কথক হিসাবে বেতারে সাড়া জাগানো 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান পরিচালনা। সাধারন মানুষের মনের কথাকে, সুপ্ত আশা ও স্বপ্নকে তিনি জীবন্ত ও মূর্ত করে তোলে ধরেছিলেন সেদিনের সেই বিপন্ন ও অসহায় মুহূর্তে।

অসম্ভব বন্ধু বৎসল, সদালাপি, সদা হাসিখুশি, তুমুল আড্ডাপ্রিয়, গোলগাল নাদুস-নুদুস অবয়ব, কাশফুল মাথা এম আর আখতার মুকুল যে কোনও ধরনের আড্ডার মধ্যমণি হয়ে উঠতে খুব বেশী একটা সময় নেন না। একাই একশ'। জাতিকুল বয়সের বালাই নেই। অতিরিক্ত সিগ্রেট ফোঁকা ঈষৎ ভাংগা গলা, মজলিশি মেজাজ আর বৈদগ্ধ্য ও অসামান্য স্মৃতিশক্তির বিরল সংমিশ্রনে তার আলাপচারিতা হয়ে ওঠে খাপখোলা তরবারির মত ঝকঝকে। সেই সংগে তীক্ষ্ম বাক্যবাণ তার প্রধান আয়ুধ। তবু মনে হয় অনেক কিছু গোপন তথ্য তিনি মনের গহনে লুকিয়ে রেখেছেন। অধিকাংশ সময় কাটে বই পড়ে, লেখালিখি করে আর আড্ডা পেলে ত কথাই নেই। সবচেয়ে আদুরে হচ্ছে পাঁচ বছরের নাতনি কুন্তলা। প্রিয় ও একমাত্র বন্ধু বড় ছেলে কবি। তার সুখ-দুঃখের সংগী। বাপ-বেটার এমন জুটি আর দু'টি হয় না। সংগে ছায়ার মতো রয়েছেন ৩৪ বছর বিবাহিত জীবনে উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রী মাহমুদা খানম রেবা।

কোনো সীমিত পরিসরে এম আর আখতার মুকুলের কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবনের বৃত্তান্ত আঁকা এক কথায় অসম্ভব। সিংহরাশির এম আর আখতার মুকুল মানেই সংগ্রামী জীবন—সংগ্রামের জীবন। আপোষহীন, অসীম সাহসী এক বীর যোদ্ধা। — বেলাল চৌধুরী।